ছাগল পালন ও চিকিৎসা

এ এইচ এম মোস্তফা

ছাগল পালন ও চিকিৎসা

(প্রথম খণ্ড)

ছাগল পালন ও চিকিৎসা

(প্রথম খণ্ড)

BANSDOC Library
Dhaka

ডাঃ এ এইচ এম মোস্তফা

বাদলা টিকা শাখা

পশু সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

BANSDOC Library

বাংলা একাডেমী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০২
জুন ১৯৯৫

বা এ ৩২৪৯

মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২১৩

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দীন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
সত্তর টাকা

CHHAGAL PALON O CHIKITSHYA (Goat farming and treatment), Vol. I, by Dr. A.H.M. Mustafa, Published by Gholam Moyenuddin, Director, Text Book Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First edition : June 1995, Price Taka 70.00 only.

ISBN 984-07-3258-7

BANSDOC Library
Accession No. 18657
Date 10-06-04

দেশের গবাদি পশু চাষাবাদে নিয়োজিত
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ। এদেশের আনাচে-কানাচে গবাদি পশুর লালন-পালন যথেষ্ট পরিমাণ দেখা যায়। ছাগল গৃহপালিত পশুর মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত গবাদি পশুর মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে ছাগলের স্থান দ্বিতীয়। এদেশে প্রতিপালিত মোট ছাগলের শতকরা ৯৮ ভাগ গ্রামে দেখা যায়। বাকি মাত্র ২ শতাংশ রয়েছে শহরে। সাধারণত ভূমিহীন, গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরাই গ্রামাঞ্চলে ছাগল পালন করে থাকে। শহরের অধিকাংশ ছাগল মালিক শখ করে ছাগল পালন করে থাকেন। তারা সাধারণত মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য ছাগল বিক্রি করেন না। বাজারের ছাগলের মাংসের মোট আমদানির শতকরা ৯৭ ভাগই আসে গ্রামাঞ্চল থেকে। ছাগলের পারিবারিক খামারগুলো এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এই দেশে ছাগলের সংখ্যাধিক্য থাকলেও অদ্যাবধি সরকারি বা বেসরকারিভাবে ছাগলের কোন আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত খামার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিষয় অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে সুখের কথা, অতি সম্প্রতি ঢাকার সাভারে ও রাজশাহীতে দুটি সরকারি ছাগল প্রজনন ও উন্নয়ন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এই দেশের মোট ছাগলের শতকরা ৪৫ ভাগ স্ত্রী ছাগল বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে, এই দেশে বছরে ১৮.২২ মিলিয়ন ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে (বছরে তিনটি বাচ্চা হিসাবে), যার শতকরা ১৬.৫ ভাগই বাচ্চা বয়সে মারা যায়। অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে বাচ্চা ছাগলের মৃত্যুর হার হচ্ছে শতকরা ৪৩.৮৫ ভাগ। তবে মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের চাহিদা কিন্তু সেই চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ছাগল সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অথচ সহজপ্রাপ্য ও সহজপাচ্য আমিষজাতীয় খাদ্য হিসেবে ছাগলের মাংসের চাহিদা কম নয়। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ১৫ গ্রাম, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ গড়ে মাত্র ৬.১ গ্রাম পেয়ে থাকেন। এই গড় হিসাব বাংলাদেশের জন্য খুবই মারাত্মক। এই হিসাবে দেখা যায় এদেশের মানুষের মোট প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের মধ্যে (৬.১ গ্রাম) মাত্র ২.০ গ্রাম ছাগল থেকে পাওয়া যায়।

ছাগল পালন একাধিক কারণে করা যেতে পারে, যেমন দুধ, মাংস, চামড়া, পশম বা লোম উৎপাদনের জন্য। সনাতন এইসব চাহিদা মেটানোর জন্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই ছাগল পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এইগুলো ছাড়াও আরেকটি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হচ্ছে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা। গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাড়ছে না শিল্প-কারখানা কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা। তাই এই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি চরম দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করছে। এই অবস্থা দিন দিন বাড়ছে। গ্রাম বাংলার ৫৯ শতাংশ পরিবার ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে কম ক্যালরি পাচ্ছে। প্রায় ৬০ শতাংশ লোক চাহিদা আনুযায়ী আমিষ পাচ্ছে না।

অধুনা সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছেন তার প্রায় ৭৫ শতাংশই কেবল বিত্তশালী কৃষকরাই ভোগ করছে। কৃষি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত এসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে ভূমিহীন শ্রেণী বঞ্চিত। আমাদের দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক কম। তাই ভূমিহীনদের মধ্যে পতিত জমি বন্টন ব্যবস্থায় ভূমিহীন বা বেকারত্বের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হবে না। এইক্ষেত্রে অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। তাই এদেশে ছাগল পালন ব্যবস্থা জনপ্রিয় ও লাভজনক করে তুলতে পারলে এবং এজন্য যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারলে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা ও বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব হতে পারে। এতে ক্যালরি ও আমিষজাতীয় খাদ্য ঘাটতিও অনেকখানি মেটানো সম্ভব। এসব চিন্তা-ভাবনাকে সামনে রেখেই ছাগল পালন বিষয়ক এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নে বিভিন্ন দেশী বিদেশী গ্রন্থ, পুস্তিকা, বিজ্ঞানপত্র ইত্যাদির সাহায্য অকৃপণভাবে নেয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচয়িতাদের কাছে আমার ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি।

পরিশেষে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

লেখক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিভিন্ন জাতের ছাগলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭
তৃতীয় অধ্যায়	খামার ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান	৫০
চতুর্থ অধ্যায়	খাদ্য–পুষ্টি ও পুষ্টি অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা	৬৮
পঞ্চম অধ্যায়	ছাগলের উপজাত দ্রব্য বেচা–কেনা	১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	ছাগলের প্রজনন	১৫৫
	তথ্যপঞ্জি	১৮৩

BANSDOC Library
Accession No.....

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে ছাগলের স্থান দ্বিতীয়। গরুর পরই ছাগলের স্থান। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সারা দেশে ছাগলের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মে, ৮৬)। মোট ছাগলের শতকরা ৯৮ ভাগ ছড়িয়ে আছে গ্রাম বাংলায়, মাত্র ২ ভাগ রয়েছে শহরে। কিন্তু এই দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাধীনে বেসরকারিভাবে ছাগলের কোন খামার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতি সম্প্রতি ঢাকার সাভারে ও রাজশাহীতে দুটি সরকারি ছাগল প্রজনন ও উন্নয়ন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত ভূমিহীন, গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরাই গ্রামাঞ্চলে ছাগল পালন করে থাকে। শহরের অধিকাংশ ছাগল মালিক শখ করে ছাগল পালন করে থাকেন। তারা সাধারণত মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য ছাগল বিক্রি করেন না। বাজারের ছাগলের মাংসের মোট আমদানির শতকরা ৯৭ ভাগই আসে গ্রামাঞ্চল থেকে। ছাগলের পারিবারিক খামারগুলো এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন হলেও বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা বাড়ছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৬০–১৯৭৭ সালে ছাগলের সংখ্যা শতকরা ৪৬ ভাগ বেড়েছে, ১৯৮৩–৮৪ সালে ছাগলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ০৩ ভাগ। এই সংখ্যা বাৎসরিক জবাইকৃত ছাগলের সংখ্যার অতিরিক্ত। বাংলাদেশে দৈনিক অনুমোদিতভাবে ৭২৮৮টি ছাগল জবাই করা হয়ে থাকে। এই হিসাবে ১৯৮৬ সালে জবাইকৃত ছাগলের মোট সংখ্যা ছিল ১৯,০২,১৬৮টি। ঢাকার একটি কসাইখানায় দৈনিক এক হাজারেরও বেশি ছাগল জবাই করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া জেলা, থানা শহর বা বড় বড় হাট–বাজার, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর ছাগল জবাই করা হয়ে থাকে। এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এই দেশের মোট ছাগলের শতকরা ৪৫ ভাগ স্ত্রী ছাগল বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় যে, এই দেশে বছরে ১৮.২২ মিলিয়ন ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে (বছরে তিনটি বাচ্চা হিসাবে), যার শতকরা ১৬.৫ ভাগই বাচ্চা বয়সে

মারা যায়। অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে বাচ্চা ছাগলের মৃত্যুর হার হচ্ছে শতকরা ৪৩.৮৫ ভাগ। অবশ্য এইসব পরিসংখ্যান তেমন বিশ্লেষণমূলক নয়। এছাড়াও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপন্থী হিসেবে স্বীকৃত। মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের চাহিদা কিন্তু সেই চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে না ছাগল সম্পদ।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ১৫ গ্রাম, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ গড়ে মাত্র ৬.১ গ্রাম পেয়ে থাকেন। এই গড় হিসাব বাংলাদেশের জন্য খুবই মারাত্মক। কারণ এই দেশের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী বছরের দুটি ঈদ ছাড়া সাধারণত মাংস খেতে পারে না। খেতে না পারা এই জনগোষ্ঠীও দৈনিক মাথা পিছু ৬.১ গ্রাম প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে বলে ধরা হয়েছে। এখানেই পরিসংখ্যানের ব্যর্থতা। মোট প্রাণিজ আমিষজাতীয় খাদ্যের মধ্যে (৬.১ গ্রাম) প্রায় ২.০ গ্রাম ছাগল থেকে পাওয়া যায়।

প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন নিয়ে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ হচ্ছে, হচ্ছে রাজনীতি। তাই বিশ্বের কোন কোন দেশ মূল্য ঠিক রাখার জন্য দুধ ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে অথচ এই বিশ্বেরই অন্য প্রান্তের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দুধ খেতে পারছে না।

ছাগল পালন একাধিক কারণে করা যেতে পারে, যেমন দুধ, মাংস, চামড়া, পশম বা লোম উৎপাদনের জন্য। সনাতন এইসব চাহিদা মেটানোর জন্যে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই ছাগল পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এইগুলো ছাড়াও আরেকটি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হচ্ছে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা। গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাড়ছে না শিল্প-কারখানা কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা। তাই এই দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি চরম দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করছে। দরিদ্র অবস্থা বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যখন মানুষের প্রতিদিনের গড় ক্যালরি গ্রহণ প্রয়োজনীয় পরিমাণের ৮০ শতাংশের কম থাকে এবং তারা ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেও অক্ষম। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এইদেশে ১৯৬৩-৬৪ সালে মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ছিল, ১৯৬৮-৬৯ সালে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ছিল, ১৯৭৪-৭৫ সালে মোট জনসংখ্যার ৪৯ শতাংশ চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ছিল এবং ১৯৮১ সালে মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ চরম দারিদ্র্য অবস্থায় ছিল।

এই অবস্থা দিন দিন বাড়ছে। গ্রাম বাংলার ৫৯ শতাংশ পরিবার ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে কম ক্যালরি পাচ্ছে। প্রায় ৬০ শতাংশ লোক প্রয়োজনীয় আমিষ পাচ্ছে না। মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোক রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।

গ্রাম-বাংলার শতকরা ৫৩.৭৪ ভাগ লোক ভূমিহীন। কৃষি জমির ৫০.৬ শতাংশের মালিক হচ্ছে ৮.৭ শতাংশ পরিবার। মাত্র ১২.৭ শতাংশ কৃষক কৃষি জমি থেকে জীবন ধারণের ন্যূনতম আয় করতে পারে । দরিদ্র কৃষক তার কৃষি খামার থেকে ৩-৪ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ফলে ৮-৯ মাসের খাদ্যের অন্য কাজ কিছু করতে হয় অথবা ঋণ করতে হয়। পরিণামে দরিদ্র কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে। সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে এর ৭৫ শতাংশ বড় কৃষকরাই ভোগ করছে। কৃষি উন্নয়নের সাথে যেহেতু ভূমির সম্পর্ক রয়েছে সেহেতু ভূমিহীন শ্রেণী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক কম। তাই ভূমিহীনদের মধ্যে পতিত জমি বন্টন ব্যবস্থায় ভূমিহীন বা বেকারত্বের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হবে না। এইক্ষেত্রে অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। এইদেশে ছাগল পালন ব্যবস্থা জনপ্রিয় ও লাভজনক করে তুলতে পারলে এবং এইজন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারলে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করাও বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব হতে পারে। এতে ক্যালরি ও আমিষজাতীয় খাদ্য ঘাটতিও বহুলাংশে মেটানো সম্ভব।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে ছাগল পালনের মাধ্যমে এদের বংশ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। চিরসবুজ এইদেশে ছাগল পালনের অনেক সুযোগ রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ ও সঠিক পালন ব্যবস্থা অনুসরণ করা। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরচক্রে একটি ছাগল খামারের অবস্থান সারণি ১-এ দেখানো হলো। ছাগল পালনের সুবিধাগুলো হচ্ছে –

১। ছাগল ছোট প্রাণী। এইজন্য গরু থেকে ছাগল পালনে কম খাদ্যের প্রয়োজন।

২। সীমিত সংখ্যক ছাগল মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। সম্ভবত বিভিন্ন প্রকার গাছ, ঘাস, লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে বলে এদের রোগ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কম মহামারী হয়ে থাকে।

৩। অল্প মূলধনে ছাগল ক্রয় ও পালন করা যায়।

৪। এদের পালন করতে অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়।

সারণি ১ ঃ বর্তমান বাংলাদেশে বছর চক্রে একটি ছাগল খামারের অবস্থান

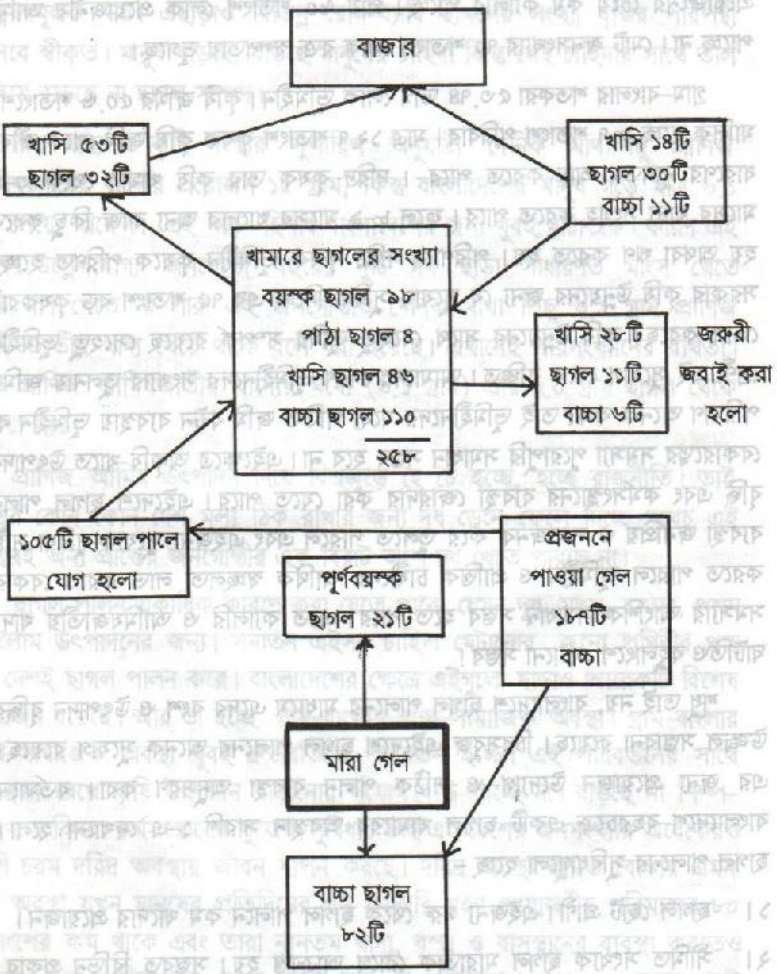

উপরের সারণির হিসাব অনুযায়ী উক্ত ছাগলের খামারে — বয়স্ক ছাগলের মৃত্যুর হার হচ্ছে ৮.১৩% এবং বাচ্চা ছাগলের মৃত্যুর হার হচ্ছে ৪৩.৮৫%।

৫। স্ত্রী ছাগলের দুধ সহজে হজম হয় এবং যক্ষ্মা রোগের জীবাণু মুক্ত থাকে।

৬। এদের মাংস সুস্বাদু ও জনপ্রিয়।

৭। এই দেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার গুণগত মান খুব উন্নত এবং বিশ্ববাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

৮। ছাগল ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হতে পারে।

৯। গাভী পালন করার জন্য যাদের সুযোগ-সুবিধা নেই তারা ইচ্ছা করলে ২-৩টি ছাগল পালন করতে পারেন।

১০। ছাগল প্রতিবারে প্রায়ই একাধিক বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে (২-৩টি)। অধিকাংশ স্ত্রী ছাগল বছরে দু'বার বাচ্চা দিয়ে থাকে।

ছাগল পালনে সমস্যা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ বাংলাদেশে ছাগল পালনে অনেক সমস্যা রয়েছে। যেমন -

১। ছাগলের পালন এবং রোগ দমন ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। ছাগল সাধারণত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের গৃহপালিত প্রাণী। ইউরোপ বা আমেরিকায় ছাগল পালন একধরনের সৌখিনতা। তাই আধুনিক ছাগল পালন ব্যবস্থা, রোগ দমন, রোগ অনুসন্ধান ইত্যাদি নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। বর্তমানে কোন কোন উন্নত দেশে ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে এইসব বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

২। এই দেশে যারা ছাগল পালন করেন তাঁদের অধিকাংশই গরীব এবং ছাগল পালনে প্রকৃত অর্থে অনভিজ্ঞ এবং উদাসীন। কোন কোন মালিকের ক্ষেত্রে ছাগলের অসুখ হলে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা বা সামর্থ্য নেই। তাই কোন কারণে যদি ছাগলের অসুখ হয় তা হলে অধিকাংশ ছাগলই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

৩। বাংলাদেশের সব জেলায় ছাগল পালনের জন্য সমভাবে উপযুক্ত নয়।

৪। সুসংগঠিত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত ছাগল পালনকারীরা ছাগলের প্রকৃত মূল্য পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বা ফরিয়া ব্যবসায়ীরাই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক ফায়দা ভোগ করে থাকেন।

৫। ছাগলের রোগ-ব্যাধির অনুসন্ধান ও এক্ষেত্রে তথ্যের অভাব।

৬। ছাগলের রোগ দমনে সীমিত সুযোগ-সুবিধা।

৭। ছাগল উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দেশের ছাগল সম্পদ রক্ষা, উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। মোরগ-মুরগির ব্রয়লার (broiler) খামার ও উন্নত দেশের শূকরের (pig) খামারের মতো এইদেশেও ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ছাগলের রোগ দমন ও সুষ্ঠু চিকিৎসার মাধ্যমে অতিরিক্ত একশত কোটি টাকার ছাগল রক্ষা করে ১০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ছাগলের মালিকেরা যাতে ছাগলের ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন এর নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যেসব এলাকায় ছাগল পালনের জন্য উপযুক্ত সেসব এলাকায় ছাগল উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। ছাগল পালনকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছাগল পালন বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গ্রাম-বাংলার শিক্ষিত মেয়েদেরকে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করে তোলা যেতে পারে। ছাগলের রোগ দেখা দিলে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রাম-বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় থানা শহর থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামের জনসাধারণ পশু চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। এই দেশের ছাগল উন্নয়নের জন্য ছাগল উন্নয়ন বোর্ড (Goat Development Board) গঠন করা যেতে পারে, যা এদেশের আমিষজাতীয় খাদ্যাভাবের আংশিক পূরণ করবে। গ্রাম-বাংলার অর্থনীতি কিছুটা সজীবতা আনবে এবং অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন জাতের ছাগলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ছাগলের শ্রেণীবিভাগ

গৃহপালিত ছাগল *Capra* গণের অন্তর্গত। নিচে ছাগলের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা হলো —

শ্রেণী (Class)	Mammalia (স্তন্যপায়ী)
বর্গ (Order)	Artiodactyla
উপবর্গ (Sub-order)	Ruminantia (রোমন্থনকারী)
গোত্র (Family)	Bovidae (গোজাতীয়)
গণ (Genus)	*Capra / Hemitragus*
প্রজাতি (Species)	*Capra hircus*

শিংভিত্তিক

পশুবিজ্ঞানীরা ছাগলের শিং দেখে শ্রেণীবিভাগ করতেন বলে অনেকের বিশ্বাস। যেমন–

(ক) বেজোয়ার (Bezoar) ঃ সর্পিল (spiral) শিংওয়ালা ছাগল। পশ্চিম এশিয়ার ছাগলগুলো বেজোয়ার শিংওয়ালা ছাগলের বংশধর।

(খ) মারখর (Markhor) ঃ এই জাতের শিংওয়ালা ছাগলের রয়েছে পাকানো (twisted) শিং। ইরান, আফগানিস্তান, উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে রয়েছে মারখর শিংওয়ালা ছাগলের বংশধর।

চিত্র ১ ঃ বেজোয়ার ছাগলের শিং

চিত্র ২ ঃ মারখর ছাগলের শিং

তবে পশুবিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, ভারত ও মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ ছাগলই বেজোয়ার ও মারখর ছাগলের বংশধর।

জন্মস্থানভিত্তিক

জন্মস্থান অনুসারেও ছাগলের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন –

(ক) এশিয়ান ছাগল (Asian goats) ঃ যেসব ছাগল এশিয়া মহাদেশের বাসিন্দা।

(খ) আফ্রিকান ছাগল (African goats) ঃ যেসব ছাগল আফ্রিকা মহাদেশের বাসিন্দা।

(গ) ইউরোপিয়ান ছাগল (European goats) ঃ যেসব ছাগল ইউরোপ ও আশে-পাশের ভৌগোলিক পরিবেশের বাসিন্দা।

(ঘ) ওরিয়েন্টাল ছাগল (Oriental goats) ঃ ভারতবর্ষ ও তার আশে-পাশের এলাকার বাসিন্দা।

তবে বিরাট ভৌগোলিক মানচিত্রে ছোট ছোট ছাগলের এই শ্রেণীবিন্যাস তেমন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়নি, কারণ একই ধরনের ছাগল একাধিক মহাদেশে দেখা যায়।

কানের আকৃতি ও দৈর্ঘ্যভিত্তিক

এটি ভেড়ার জাত শ্রেণীবিন্যাসের জন্য ছাগল থেকে অধিক কার্যকর, কারণ একই জাতের ছাগলের কানের আকৃতি ও দৈর্ঘের মধ্যে বেশ পার্থক্য থাকে বলে তা উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বিধায় এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি।

উৎপাদন ক্ষমতাভিত্তিক

উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ছাগলকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

(ক) মাংসের ছাগল (Meat type goats)

(খ) দুধের ছাগল (Milk type goats)

(গ) পশমের ছাগল (Hair type goats)

কিছু কিছু ছাগলকে সফলভাবে এইজাতীয় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন যে ছাগল থেকে বেশি পরিমাণ মাংস পাওয়া যায় তাকে মাংসের ছাগল বলা যায়, যা থেকে বেশি দুধ পাওয়া যায় তাকে দুধের ছাগল বলা যায় এবং যে সব ছাগল থেকে প্রচুর পশম পাওয়া যায়, তাকে পশমের ছাগল বলা যায়, যেমন এ্যাংগোরা জাতের

ছাগল। কিন্তু অনেক ছাগল দ্বৈত উৎপাদনের জন্য ব্যবহার বা পালন করা যায় যেমন পাকিস্তানে দেরা দীন পানাহ (Dera Deen Panah) । এই জাতীয় ছাগল দুধ ও মাংস উভয়ের জন্য ভাল।

শরীরের আকৃতিভিত্তিক

পূর্বে বর্ণিত শ্রেণীবিভাগগুলো থেকে এটির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

ছাগলের স্কন্ধ পর্যন্ত উচ্চতার ভিত্তিতে (height at withers) ছাগলকে তিন দলে বিভক্ত করা যায়। যেমন –

১.	বড় জাতের ছাগল	উচ্চতা	৬৫ সেমি. এর উপর
	(Large breeds)	ওজন	২০–৬৩ কেজি
		উৎপাদন গুণ	দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী
২.	ছোট জাতের ছাগল	উচ্চতা	৫০ – ৬৫ সে.
	(Small breeds)	ওজন	১৯–৩৭ কেজি
		উৎপাদন গুণ	দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী
৩.	বামন জাতের ছাগল	উচ্চতা	৫১ সেমি. এর নিচে
	(Dwarf breed)	ওজন	১৮–২৫ কেজি
		উৎপাদন গুণ	মাংস উৎপাদনকারী।

বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এই বামন জাতের শ্রেণীভুক্ত।

সারণি ২ঃ কাঁধের মাপের (height at withers) উপর নির্ভর করে বড় জাতের ছাগলের শ্রেণীবিন্যাস, অবস্থিতি ও উৎপাদনের জন্য উপযুক্ততা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য।

মহাদেশের নাম	জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা (সেমি.)	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন (কেজি)	উৎপাদন
এশিয়া (পশ্চিম)	এ্যাংগোরা (Angora)	তুরস্ক, ইসরাইল, লেবানন সিরিয়া, সাইপ্রাস	৬১–৬৫	২৫–৩০	লোম
	দামাস্কাস (Damascus)	দক্ষিণ এনাটুলিয়া	৭৩–৭৬	৫৫–৬০	দুধ
	মালটিসি	মালটা, গ্রিস ও তুরস্ক	৬৫–৭৫	৪০–৪৫	দুধ

মহাদেশের নাম	জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা (সেমি.)	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন (কেজি)	উৎপাদন
	(Maltese)				
	সিরিয়ান মাউন্টেইন (Syrian Mountain)	ইসরাইল, লেবানন, তুরস্ক জর্ডান, দক্ষিণ এনাটুলা	৬৯–৮০	৩৫	মাংস দুধ
এশিয়া	বারবারী (Barbari)	উত্তর ও মধ্য ভারত ও পাকিস্তান	৬০–৭৫	৩৫–৪০	দুধ
	বিটাল (Beetal)	পাঞ্জাব, ভারত ও পাকিস্তান	৮৪–৮৯	৪৫–৬৫	দুধ
	চেপার (Chapper)	সাইপ্রাস, দক্ষিণ এনাটুলিয়া	৬০–৭০	২০–২৬	মাংস
	দেরাদীন পানাহ (Dera Deen Panah)	পাকিস্তান	৬৫–৮০	৪০–৪৫	মাংস ও দুধ
	গাদ্দি (Gaddi)	পাঞ্জাব, হিন্দু প্রদেশ (ভারত) পাকিস্তান	৮০–৮৬	২০–৩০	মাংস ও দুধ
	যমুনাপারী (Jamna pari)	উত্তর ও মধ্য ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান	৭৮–১০০	৬৫–৭৫	দুধ
	কাঘানী (Kaghani)	পাকিস্তান	৬৫–৭৫	৩০–৩৬	মাংস ও লোম
	কাশ্মীরী (Kashmiri)	কাশ্মীর, ভারত, পাঞ্জাব হিন্দু প্রদেশ	৬৫–৮০	৩০–৩৬	পশমিনা
	মালাবার (Cutch)	দক্ষিণ ভারত	৭৬–৮০	৪০	দুধ
	মালাবার (Tellichary)	দক্ষিণ ভারত	৬৫–৭০	৩৬	দুধ
	মারোয়ারী (Marwari)	সৌধপুর, ভারত	৫৫–৬৫	২৫–৩০	দুধ ও মাংস
	সিরহি (Sirohi)	গুজরাট, ভারত	৫৫–৬৫	৪০–৫০	মাংস

মহাদেশের নাম	জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা (সেমি.)	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন (কেজি)	উৎপাদন
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	ইটাওয়া (Etawah)	ইন্দোনেশিয়া	৭০–৮০	৪০–৪৫	মাংস
	ফিলিপাইনস (Philippines)	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৫০–৭০	২৫–৩৫	মাংস ও লোম
আফ্রিকা	ম্যাবাইট (Meabite)	আলজেরিয়া	৭০–৮৩	২৩	দুধ
	ম্যারাদি (Maradi)	নাইজার	৬২–৭২	২৩–২৮	মাংস ও চামড়া
	ন্যাটিভ (Native)	জায়ার	৫০–৬০	৩৫–৪০	মাংস
	সাহেল (Shahel)	পশ্চিম আফ্রিকা	৭০–৮৫	২৫–৩৪	মাংস দুধ
	সুদান ডেজার্ট (Sudan Desert)	সুদান	৬৫–৮০	৩৩–৩৮	মাংস ও চামড়া
	সুদানীজ (Sudanese)	উত্তর সুদান	৭১–৮০	২৭	দুধ
	নিউবিয়া (Nubian)	দক্ষিণ সোমালিয়া	৭০–৭৮	৩২–৩৬	মাংস
	বেনাদির (Benadir)	দক্ষিণ সোমালিয়া	৭০–৭৮	৩২–৩৬	চামড়া
	মুধুগ (Mudhug)	উত্তর সোমালিয়া	৬৫–৭৫	৩৭–৪৩	মাংস চামড়া
	শুকরিয়া (Shukria)	পশ্চিম ইথিয়োপিয়া	৭০–৮৫	৪০–৬০	দুধ
	এ্যাংগোরা (Angora)	দক্ষিণ আমেরিকা		৩৬–৪৬	লোম
উত্তর আমেরিকা	এ্যাংগোরা (Angora)	টেকসাস, ইউ এস এ		৩৪	লোম
	মক্সোটো (Moxoto)	উত্তর-পূর্ব ব্রাজিল	৬৩–৬৫	৩১	চামড়া

সারণি ৩ : কাঁধের মাপের (height at withers) উপর নির্ভর করে ছোট জাতের ছাগলের শ্রেণীবন্যাস, অবস্থিতি ও উৎপাদনের জন্য উপযুক্ততা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য।

মহাদেশের নাম	জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা (সেমি.)	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন (কেজি)	উৎপাদন
এশিয়া	এনাটুলিয়ান ব্লাক (Anatolian Black)	তুরস্ক	৫৫–৬৫	৩৫–৪২	দুধ, মাংস ও লোম
পশ্চিম এশিয়া	এ্যাংগোরা (Angora)	তুরস্ক	৫৬–৬০	২৯	লোম
	কিলিস (Kilis)	তুরস্ক	৬০–৬৫	৫০–৫৫	দুধ
	গ্যাঞ্জাম (Ganjam)	ভারত	৫৫–৬০	২৮–৩৫	মাংস
	কাগামী (Kaghani)	পাকিস্তান	৬০–৬৫	২০–২৪	
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	ক্যাটজাং (Katjang)	মালয়েশিয়া	৫৬–৬৫	২৩	মাংস
		ইন্দোনেশিয়া	৫০–৬৫	৩০	মাংস
	মা টাওইউ (Ma Tou)	চীন ও মধ্য চীন	৪৫–৬৫	২৩	মাংস
	দক্ষিণ চীন		৫০–৫৫		
আফ্রিকা	কিগেজি (Kigezi)	উগাণ্ডা	৬৫	২৬	দুধ
	সোমালী (Somali)	সোমালী	৬২	২৬	দুধ
আমেরিকা	ক্রাইলো (Criollo)	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ল্যাটিন আমেরিকা	৫০–৬৫	৩৪	মাংস
	মক্সোটু (Moxoto)	উত্তর-পূর্ব ব্রাজিল	৬২	৩১	দুধ/মাংস
ফিজি (Deconia)	ফিজি (Fiji)	ফিজি	৫৮–৬৬	২০–২৫	মাংস

সারণি ৪ : কাঁধের মাপের (height at withers) উপর নির্ভর করে বামন জাতের ছাগলের শ্রেণীবন্যাস, অবস্থিতি ও উৎপাদনের জন্য উপযুক্ততা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য।

মহাদেশের নাম	জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা (সেমি.)	প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন (কেজি)	উৎপাদন
এশিয়া	বেঙ্গল (Bengal)	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান	৪৫–৫০	০৯–২২	মাংস
	দক্ষিণ চীনা (South China)	কোয়ানটাং ইয়ানানা চীন	৫০	২৫	মাংস
আফ্রিকা	সুদান	সুদান	৪০–৫০	১১	মাংস
	আফ্রিকান	পূর্ব আফ্রিকা	৫০	২৫	মাংস
	কংগো বামন (Congo-Dwarf)	আপার নাইল, উগাণ্ডা জায়ার	৪৫–৫০	২৫–৩০	মাংস
	কসি (Kosi)	ক্যামেরুন, ঘানা, গিনি	৪৫–৫০	১৫–২১	মাংস
	পশ্চিম আফ্রিকান বামন (West African Dwarf)		৪০–৫০	১৮–২০	মাংস

সারণি ৫ ঃ এশিয়া অঞ্চলের অধিক দুধ উৎপাদনে সক্ষম কয়েকটি জাতের ছাগলের প্রয়োজনীয় তথ্য।

ছাগলের জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	দুধ উৎপাদন (Milk yield) (কেজি)	দুধ দেয়ার সময়কাল দিন	প্রতিদিন দুধ উৎপাদনের গড় পরিমাণ (কেজি)	দুধে ননীর উপস্থিতির শতকরা হার
বিটাল (Beetal)	ভারত	২০০.১	২০৮	১.০	৫.২
বরবারী (Barbari)	ভারত	১১৮.০	১৮৩	০.৬	৩.৯
যমনাপারী (Jamnapari)	ভারত	১৮২.০	১৬৮	০.৯	৪.৫
বিটাল (Beetal)	পাকিস্তান	১৪৬.৮	১৮৬	০.৮	৪.৯
বারবারী (Barbari)	পাকিস্তান	১০০.০	১০০	১.০	৪.১

ছাগলের জাত (Breed)	অবস্থিতি (Location)	দুধ উৎপাদন (Milk yield) (কেজি)	দুধ দেয়ার সময়কাল দিন	প্রতিদিন দুধ উৎপাদনের গড় পরিমাণ (কেজি)	দুধে ননীর উপস্থিতির শতকরা হার
বাইকেনারী (Bikaneri)	পাকিস্তান	৭৫.০	১০০	০.৮	৫.১
চেপার (Chapper)	পাকিস্তান	৭৫.০	১০৫	০.৭	৫.২
দেরা দীন পানাহ	পাকিস্তান	২০৪.৫	১৩০	১.৬	৪.৯
বামানী (Damani)	পাকিস্তান	১০৬.৮	১০৫	১.০	
কামোরী (Kamari)	পাকিস্তান	২২৭.৩	১২০	১.৯	৪.৭
ম্যালার (Malabor)	ভারত	১৮০.৬	১৮০	১.০	৫.১

সূত্র : দেবেন্দ্র /৭৬

বিভিন্ন জাতের ছাগলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ জাতের (Breeds & Types) ছাগল রয়েছে। এগুলোর চারিত্রিক (characteristics) বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। যে ছাগল দুধ দেয় সে ছাগল থেকে মাংস ও চামড়া পাওয়া যায়, কিন্তু মাংস জাতের (meat type) ছাগলও মাংসের সাথে বিশিষ্ট স্বাদ, গন্ধ ও উন্নত গুণসম্পন্ন দুধ দিতে পারে । চামড়ার জন্য নির্বাচিত জাতের ছাগলের চামড়া ও লোমের জন্য বিখ্যাত ছাগলের লোম অন্যান্য ছাগল থেকে আলাদা এবং এটাই জাতের বৈশিষ্ট্য (Breed characters)। বর্তমানে পশুবিজ্ঞানীরা ছাগলের আকাঙ্ক্ষিত গুণটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত (transfer) করতে সক্ষম।

ছাগলের জাতের নাম

১। এ্যাংগোরা ছাগল (Angora Goats)

এই ছাগলের অন্য নাম হচ্ছে সাইবোকি (sybokke)। এই সুবিদিত ছাগলের জাতটির আদি নিবাস মধ্য চীনে। সেখান থেকে ১৯ শতকে তুরস্কের এনাটুলিয়াতে এটি আমদানি করা হয়। কাঁধের মাপের পদ্ধতিতে (height at withers) এগুলোর গড় উচ্চতা হচ্ছে ৫৪–৬০ সেমি.। এগুলোর লোম বেশ বড়, প্রায় ১৩–২৫ সেমি. লম্বা ও উজ্জ্বল। এই জাতীয় লোমের (Mohair) জন্য এই ছাগলের মূল্য বেশি। এই জাতের ছাগল সবচেয়ে বেশি রয়েছে তুরস্কে – প্রায় ৬০ লক্ষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে ২০ লক্ষ। তাছাড়া এই জাতের ছাগল রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, আমেরিকা, পাকিস্তান, মাদাগাস্কার, ফিজি ও ভারতে। বাচ্চা ছাগলের জন্মকালীন ওজন গড়ে ১ থেকে ১.৫ কেজি (The Average birth weight of kids)।

চিত্র ৩ ঃ এ্যাংগোরা পাঠা ছাগলের শিং ও লোমের প্রকৃতি দেখানো হচ্ছে

গড়ে বাচ্চা প্রসবের হার –এক (litter size is 1 kid/ birth)। শরীরের ওজনের শতকরা ৪৮–৫৩ ভাগ মাংস পাওয়া যায়। এই জাতের ছাগলের সাথে ভারতে গাদি (Gaddi) ছাগলের প্রজনন করে লোমের গুণাগুণ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র ৪ ঃ এ্যাংগোরা ছাগলের লোম দেখানো হচ্ছে

তুরস্কে প্রতিটি ছাগল থেকে প্রতিবছরে ১.৫ কেজি লোম পাওয়া যায়। আমেরিকায় প্রতিটি ছাগল থেকে প্রতি বছরে ২.৯ কেজি লোম পাওয়া যায়। দুধ উৎপাদন কম। দৈনিক মাত্র ০.৪ কেজি। প্রতি দুগ্ধদানকালীন (Lactation period) সময়ে অর্থাৎ ৯৮ দিনে ৪৭ কেজি দুধ পাওয়া যায়। দুধে ননীর শতকরা হার হচ্ছে ৫.৭ ভাগ।

২। দামাস্কাস (Damascus) জাতের ছাগল

এই ছাগলের অন্যান্য নাম হচ্ছে –

(ক) বেলানি

(খ) দামানসিন (Damanseene)

(গ) শামী (Shami)

দামাস্কাস ছাগল থেকে মিশরে জারাইবি (Zaraibi), সুদানে নিউবিয়ান (Nubian) ছাগলের উৎপত্তি। এইজাতের (দামাস্কাস) ছাগলকে তুরস্কের স্থানীয় ছাগলের সাথে (Anatolian Black native) প্রজনন করে কিলিস (kilis) জাতের ছাগলের উদ্ভব করা হয়েছে। এই ছাগলের পূর্বপুরুষকে (ancesters) ভারতে দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের বংশধর বলে অনেকে মনে করেন। এই ছাগলের শিং নেই (polled)। এই ছাগলের রং সাধারণত লাল বা লাল-সাদা। কান লম্বা। কাঁধের মাপ

পদ্ধতি অনুসারে এদের গড় উচ্চতা ৫৮ থেকে ৬৫ সেন্টিমিটার। এই জাতের পুরুষ ছাগলের ওজন ৬০ কেজি ও স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫৫ কেজি।

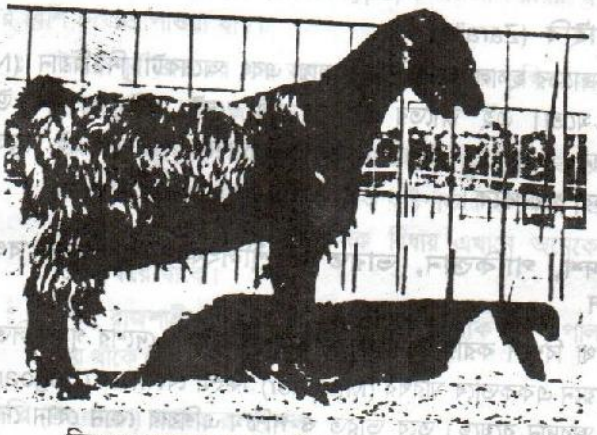

চিত্র ৫ ঃ দামাস্কাস জাতের স্ত্রী ছাগল দেখানো হয়েছে

শিশু বাচ্চা ছাগলের ওজন (weight birth) ৪ কেজি। প্রতি প্রসবকালে গড়ে বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা ১.৮টি। দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৪.১ কেজি। এক দুগ্ধদানকালে অর্থাৎ ২৬৯ দিনে প্রতিটি স্ত্রী ছাগল মোট দুধ উৎপাদন করে ৫২৩ কেজি। দুধে ননীর উপস্থিতির শতকরা হার হচ্ছে ৪.১ ভাগ। এই জাতের ছাগল সিরিয়া, লেবানন ও সাইপ্রাসে দেখা যায়।

৩। সিরিয়ান মাউনটেইন (Syrian Mountain)

এই জাতের ছাগলের অন্য নাম হচ্ছে –

(ক) জেলাব (Djelab)
(খ) জেবেল (Jebel)
(গ) ইরাকি (Iraqui)
(ঘ) মাম্বার (Mamber)
(ঙ) প্যালেস্টিনিয়ান (Palestinian)
(চ) সিরিয়ান ব্ল্যাক (Syrian black)

এই জাতের ছাগলের আকৃতি ও উৎপাদন ক্ষমতা একটির সাথে অন্যটির বেশ তারতম্য থাকে। সিরিয়ান জাতের ছাগলটি সাধারণত কালো। শিং আছে, লোম লম্বা। কানের লতি লম্বা। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে উচ্চতা ৬৯ থেকে ৮০ সে.মি.। এইজাতের ছাগল বছরে একবার মাত্র বাচ্চা দেয়।

৪। জারাইবি (Zaraibi)

এই জাতের ছাগল মিশরে পাওয়া যায় এবং অনেকটা নিউবিয়ান (Nubian) ছাগলের মতো। এই জাতের ছাগলের শিং নেই। এইগুলো দুধ উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। কদাচিৎ মাংস উৎপাদনের জন্যও এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকার ছাগলের বংশধরের ইতিহাস

একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে এইসব দেশের গৃহপালিত ছাগলের জাত উন্নয়নে এককভাবে মারখর (Markhor) কিংবা বেজোয়ার (Begoar) জাতের ছাগলের অবদান রয়েছে। তবে ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন দেশে মারখর জাতের ছাগলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি পরিলক্ষিত হয়। মারখর জাতের ছাগলের সাথে বেজোয়ার জাতের ছাগলের অবাধ প্রজনন হয়েছে বলে পাকানো শিং-বিশিষ্ট (Twisted horn) ছাগল ইরান, আফগানিস্তান, উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় দেখায় যায়। পশ্চিম এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দেশসমূহে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করতে দেখা যায় এবং সেইসব অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের ও ধরনের ছাগল রয়েছে। ছাগলের বিভিন্ন জাত ও ধরন থাকলেও কালো রঙের ছাগলের সংখ্যা সাদা ছাগলের সংখ্যা থেকে বেশি দেখা যায়। মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের সাথে দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের রং বা শিং-এর আকৃতিতে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। এইসব অঞ্চলে অধিক দুধ উৎপাদনসক্ষম কয়েকটি ছাগলের সংক্ষিপ্ত তথ্য সারণি ১৪-এ দেখানো হয়েছে।

ভারতের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (Council of Scientific Industrial Research of India) ছাগলকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছে

১। কাশ্মীর ছাগল (Kashmir like goats) ঃ এই জাতের ছাগল হিমালয়ের পাদদেশে দেখা যায়।

২। কালো জাতের মাংসের ছাগল (Black meat goats) ঃ এই জাতের ছাগল সাধারণত দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়।

৩। দুধের ছাগল (Milking goats) ঃ এই জাতের ছাগল উত্তর ভারতে বেশি দেখা যায়।

৪। ছোট আকারের মাংসের ছাগল (Meat type) ঃ বঙ্গোপসারের কাছাকাছি এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

ভারত ঃ উত্তর পূর্ব ভারতের গঙ্গা অববাহিকা, হিমালয়ের দাক্ষিণাত্যে এইসব ছাগল পালন বেশ জনপ্রিয়।

পাকিস্তান ঃ কালাত, কুয়েটা, হায়েদ্রাবাদ, পেশোয়ার, মুলতান, ভাওয়ালপুর, সারগুদা। এইসব এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫১০ মিমি.। এই শুষ্ক এলাকায় ছাগল পালন লাভজনক বিধায় এখানে অনেকে ছাগল পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ঃ ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

৫। বারবারি (Barbari) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল ভারতে উত্তর প্রদেশ, হারিয়ানা অঞ্চলে ও পাকিস্তানে অধিক পালন করা হয়ে থাকে। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬০–৭০ সেমি., কান

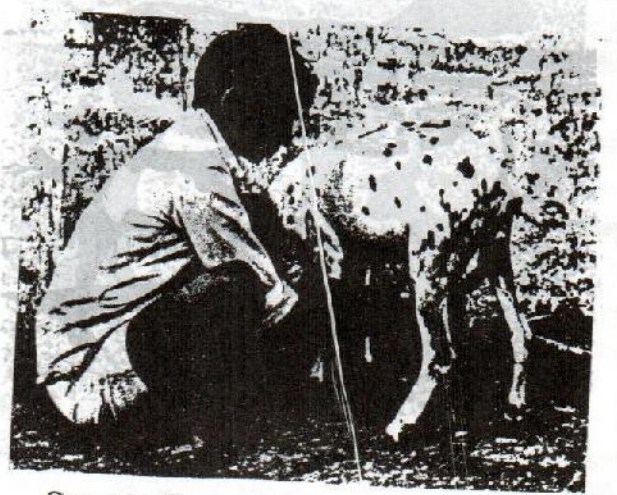

চিত্র ৬ ঃ বারবারি ছাগল থেকে দুধ দোহনের প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে

ছোট, সাদা রঙের মধ্যে লাল লাল মোটা দাগ রয়েছে। এই জাতের ছাগল তাড়াতাড়ি প্রাপ্তবয়স্ক হয়। উলান ও বাঁট বড় বড়, ১২-১৫ মাস সময়ে দু'বার বাচ্চা দেয়। আধুনিক খামারে পালনের (stall feeing) জন্য খুবই উপযুক্ত। বয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৪০ কেজি এবং বয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৩৫ কেজি।

প্রতিদিন গড়ে ১ কেজি দুধ দেয়। ১৮৩ দিনে (এক দুগ্ধ দানকালীন সময়ে) ১১৮ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। চিত্রে বারবারি ছাগল থেকে দুধ দোহনের প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে।

৬। বিটাল (Beetal) জাতের ছাগল

ভারত উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য ছাগলের জাত হচ্ছে বিটাল (Beetal)। ভারতের পাঞ্জাব, শিয়ালকোট, জেলাম, গুরুদাসপুর, পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর এবং বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এই জাতের ছাগল পালন করতে দেখা যায়। কান বড় ও ঝোলানো, অনেকটা যমুনাপারী ছাগলের মতো। তবে কিছুটা ছোট আকারের। ছাগলে লাল রঙের মধ্যে সাদা সাদা ফোঁটা দেখা যায়। চিত্র ৭-এ বিটাল জাতের একটি ছাগল ও যমুনাপারী একটি ছাগলের ছবি পাশাপাশি দেখানো হলো।

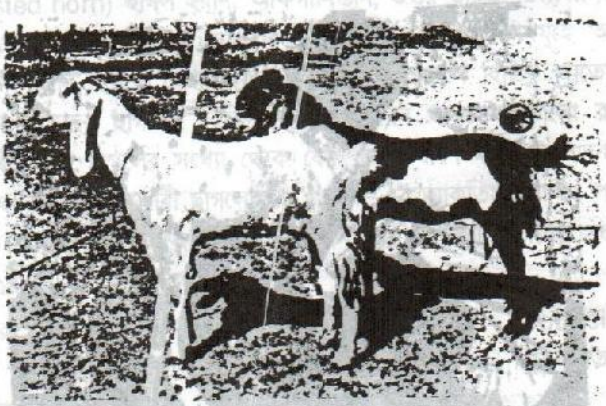

চিত্র ৭ঃ • চিহ্নিত ছাগলটি বিটাল জাতের

কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে গড় উচ্চতা হচ্ছে ৮৪–৮৯ সেমি.। এই জাতের ছাগলে শিং আছে। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে কিন্তু স্ত্রী ছাগলের দাঁড়ি নেই। যমুনাপারী ছাগল থেকে এইগুলো বেশি কষ্টসহিষ্ণু এবং এজন্য এইগুলো পাঞ্জাবে পালন করা সম্ভব। প্রতিবারে এক জোড়া বাচ্চা প্রসব এইজাতের ছাগলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা যমুনাপারী ছাগলে কদাচিত দেখা যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬৫ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪৫ কেজি।

বাচ্চা ছাগলের ওজন ১ কেজি। এরা ২০–২২ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা প্রসব করে। প্রতিটি স্ত্রী ছাগল গড়ে এক কেজি দুধ দেয়, তবে কোন কোন স্ত্রী ছাগল ৪.৫ কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়। স্ত্রী ছাগল ২০৮ দিনে ২০০ কেজি দুধ দিয়ে থাকে।

৭। ব্ল্যাক বেঙ্গল (Black Bengal) ছাগল

এই জাতের ছাগল বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ভারতে পালন করতে দেখা যায়। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এই জাতের ছাগলের উচ্চতা ৪০–৪৫ সেমি.। এই জাতের ছাগল সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে তবে সাদা ও বাদামি রঙের ছাগলও দেখা

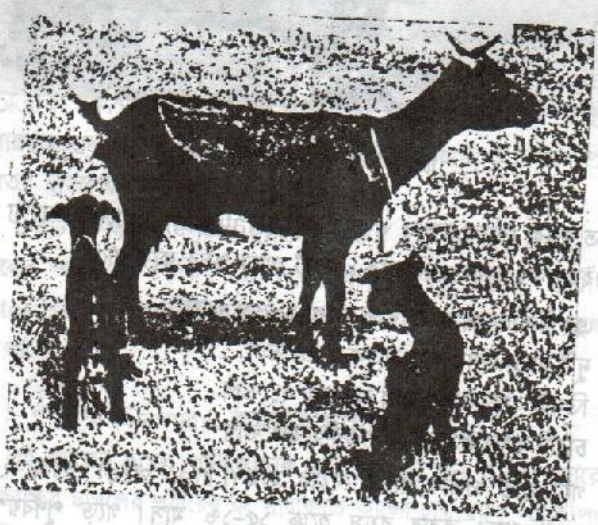

চিত্র ৮ঃ ক্যাটজাং জাতের ছাগল

যায়। এই জাতের ছাগলের গায়ের লোম ছোট ও নরম, কান ছোট, স্ত্রীপুরুষ উভয় ছাগলেরই শিং রয়েছে। এই জাতের ছাগলের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্যাটজাং জাতের ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে।

চিত্র ৯ ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল স্ত্রী ছাগল

ছবিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ক্যাটজাং (Katjang) ছাগলের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এইজাতের ছাগল প্রতিবারে ১-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে।

(ক) একটি বাচ্চা প্রসব করে শতকরা ২২ভাগ খাসি
(খ) দুটি বাচ্চা প্রসব করে শতকরা ৫৪ ভাগ
(গ) তিনটি বাচ্চা প্রসব করে শতকরা ২১ ভাগ
(ঘ) চারটি বাচ্চা প্রসব করে শতকরা ০৩ ভাগ
(ঙ) গড়ে প্রতি প্রসবে বাচ্চা দেয়ার হার (Litter size) হচ্ছে ২.১। প্রথম বাচ্চা প্রসব করার বয়স হচ্ছে ১৫-১৬ মাস। গড়ে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ১৫ কেজি। গড়ে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ১২ কেজি।

এই জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। বিশ্ববাজারে এর চামড়ার চাহিদা অত্যধিক। তাই মাংস ও চামড়ার জন্য এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। এই জাতের ছাগল খুব কম দুধ দিয়ে থাকে। অনেক সময় উৎপাদিত দুধ বাচ্চাদের চাহিদা মেটাতে পারে না। দৈনিক দুধ উৎপাদন ০.৪ কেজি। স্ত্রী ছাগলে ১০৫ দিন দুগ্ধদানকালে ৪৪ কেজি দুধ দিয়ে থাকে।

৮। চাপ্পার (Chapper) জাতের ছাগল

পাকিস্তানের হায়েদ্রাবাদের কোহিস্তান এলাকায় এই জাতের ছাগলের জন্মস্থান। এই জাতের ছাগলের রং কালো লোম লম্বা, কান ছোট। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে উচ্চতা ৬০–৭০ সেমি.।

এই জাতের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ২৬ কেজি। এই জাতের পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। এই জাতের ছাগল থেকে ভাল গুণাগুণসম্পন্ন মাংস পাওয়া যায়। স্ত্রী ছাগল দৈনিক গড়ে এক কেজি দুধ দেয়। প্রতিবার গড়ে ৬০০ গ্রাম লোম পাওয়া যায়।

৯। চেগু (Chegu) জাতের ছাগল

অন্যান্য নাম ঃ ক্যাংগ্রা ভেল্লি (Kangra Velly)। এই জাতের ছাগলের সাথে গাদ্দি (Gaddi) ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে। এইগুলো স্পাইট (spite), ইয়োকসার (yoksar), কাশ্মীর, তিব্বত, ও উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে দেখা যায়। এই জাতের ছাগল সাধারণত সাদা রঙের হয়ে থাকে তবে মিশ্র রঙের ছাগলও দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতের ছাগলের লোম লম্বা।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৩৫ কেজি। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। প্রতিবার গড়ে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে (Litter size)। পশমিনা (hair) মাংস ও দুধের জন্য এই ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

১০। দামানী (Damani) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল পাকিস্তানের ডেরাইনমাইন খান ও পেশোয়ারে পাওয়া যায়। এই জাতের ছাগলের শরীরের রং সাধারণত কালো হয়ে থাকে, তবে পা ও কানের রং বাদামি হয়ে থাকে। কান এবং শিং দুই-ই ছোট, যথাক্রমে ১২ ও ১৪ সেমি.। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এই জাতের ছাগলের উচ্চতা ৬৫–৬৫ সেমি.। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ

ছাগলের ওজন ২৪ কেজি। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। পা, উলান (Udder), বাঁট (Teat) বেশ সুঠাম। দৈনিক গড়ে ১.২ কেজি দুধ দেয়। প্রতি দুগ্ধদানকালীন (Lactation period) ১০৫ দিনে ১০৬ কেজি দুধ দিয়ে থাকে।

১১। দেরা দীন পানাহ (Dera Deen Panah) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল প্রধানত পাকিস্তানের দেরামাজীখানে দেখা যায়। মোজাফরগারথম ও মুলতানে ও এইজাতের ছাগল পালন করতে দেখা যায়। এই জাতের ছাগল সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে, তবে লাল রঙের ছাগলও দেখা যায়। এই জাতের ছাগলের শক্ত কোঁকড়ানো (spiral) ও বাঁকা (curve) শিং রয়েছে যা ২২ থেকে ৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। কান ১৫ সেমি. লম্বা। এটি লম্বা জাতের ছাগল। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এই জাতের ছাগলের উচ্চতা ৬৫–৮০ সেমি.। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৪০ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪৫ কেজি। গড়ে প্রতিবার বাচ্চা প্রসবের হার ১.৮টি। প্রতিদিন দুধ উৎপাদন ২ কেজি। প্রতি দুগ্ধদানকালীন ১৩০ দিনে ২০৫ কেজি দুধ দিয়ে থাকে। দুধে ননীর উপস্থিতি হচ্ছে ৪.৯%। প্রতিটি ছাগল থেকে প্রতি বছর এক কেজি লোম পাওয়া যায়।

১২। গুজরাটি (Gujarati) জাতের ছাগল

অন্যান্য নাম হচ্ছে ভোংরি (Bhungri), কুচি (Cutchi), কাথিয়া ওয়ারী (Kathia Wari), মেশানা (Meshana), জেলাওয়াদী (Zalawadi)।

এই জাতের ছাগলের জন্মস্থান গুজরাট ও রাজস্থানে। এটি মধ্যম আকারের ছাগল। এই জাতের ছাগলের গায়ে উজ্জ্বল লোম রয়েছে। এদের ঝোলানো কান ও পাকানো শিং রয়েছে। দুধ, মাংস ও লোম উৎপাদনের জন্য এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক গড়ে ১ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে।

১৩। গাদ্দি (Guddi) জাতের ছাগল

পাঞ্জাবের ক্যাঙ্গরা ও কুবু (Kubu) উপত্যকার গাদ্দি সম্প্রদায় (যাযাবর) এই জাতের ছাগল পালন করে থাকে। এই জাতের ছাগল ভারতের সিমলা, হিমাচল প্রদেশে এবং পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে পালন করতে দেখা যায়। এই জাতের ছাগলের সাথে চেগু ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে, তবে গাদ্দি ছাগল আকারে বড়। কাঁধের মাপ পদ্ধতি অনুসারে এদের উচ্চতা ৮০–৮৬ সেমি.।

এই জাতের ছাগল সাধারণত সাদা তবে লাল ও ধূসর রঙের ছাগলও রয়েছে।

এই জাতের ছাগলের কান লম্বা, প্রায় ২২–২৮ সেমি.। এদের লোমও লম্বা, প্রায় ১৮–২৫ সেমি.। শিং আছে। এরা অসমতল শুষ্ক আবহাওয়াতে জীবন ধারণ করতে পারে।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৩০ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। স্ত্রী ছাগল ১৯ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে গড়ে ১.২টি বাচ্চা দিয়ে থাকে।

১৪। গেঞ্জাম (Ganjam) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে দেখা যায়। যাযাবর সম্প্রদায়ই এই জাতের ছাগল বেশি পালন করে থাকে। এরা কালো রঙের হয়ে থাকে, তবে সাদা ও ধূসর রঙের ছাগলও দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে, স্ত্রী ছাগলের কদাচিত দাঁড়ি থাকে। শিং স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগলেরই রয়েছে। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৫৫–৬০ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৩৫ কেজি। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২৮ কেজি। শিশু বাচ্চা ছাগলের ওজন ২.২ কেজি। বছরে দু'বার বাচ্চা দেয়। গড়ে প্রতি প্রসবে ১–৬ টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। প্রথম বাচ্চা দেয়ার বয়স ২৫ মাস। মাংসের জন্য এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ০.৪ কেজি দুধ দেয়।

১৫। যমুনাপারী (Jamunapari) জাতের ছাগল

বাংলাদেশের রাজকীয় ছাগল এবং সবচেয়ে বড় জাতের ছাগল হলো যমুনাপারী ছাগল। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এর উচ্চতা ৭০–১০০ সেমি. পূর্ণবয়স্ক একটি ছাগলের ওজন ৬৫–৭৫ কেজি। গঙ্গা, যমুনা, চম্বল নদীর তীরবর্তী এলাকা এদের আদি বাসস্থান। এই জাতের ছাগল কালো ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। কান বড় ও লম্বা, ২৫–৩১ সেমি.। ছোট খড়্গ (scimitar) আকৃতির শিং রয়েছে। উলান ও বাঁট বেশ সুঠাম (well developed)। এই জাতের ছাগলের সাথে পশ্চিম এশিয়ার নিউবিয়ান (Nubian) জাতের ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকে ভারতের বিড়াল (Bedal) জাতের ছাগলের সাথে যমুনাপারী ছাগলের মিল খুঁজে পান।

এরা মাঠে চড়ে খেয়ে জীবন ধারণ করতে পছন্দ করে। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় (Stall feeding) এরা উৎপাদনে তেমন সুফল দিতে পারে না তবে মাঠে চড়া ও স্টল ফিডিং এই দু'য়ের সমন্বয়ে এদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

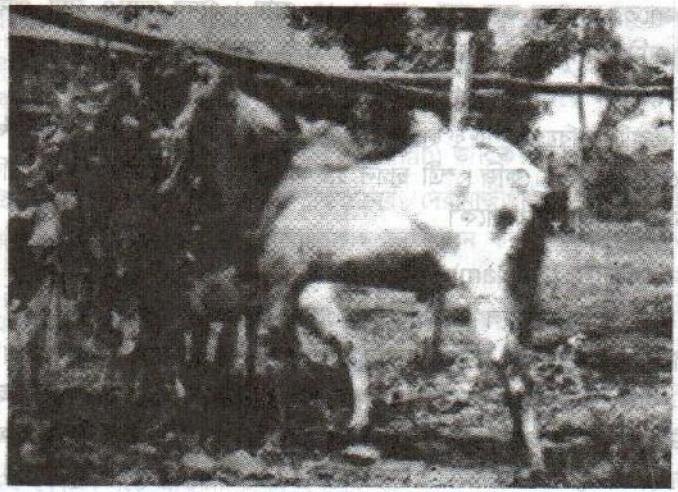

চিত্র ১০ ঃ যমুনাপারী ছাগল

এই জাতের ছাগল প্রতিবার গড়ে ১.২–১.৪ টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এদেরকে দুধ ও মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ১–৩ কেজি দুধ দেয় এবং দুধে ননীর উপস্থিতি ৫.২%। এইসব গুণের জন্য দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই জাতের ছাগলের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

১৬। কাঘানি (Kaghani) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগলের আদি বাসস্থান কাঘান (Kaghan) উপত্যাকায়। উত্তর পাঞ্জাব ও সোয়াত এলাকায় এদের দেখা যায়। সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে তবে কালো–সাদা, ধূসর রং, ও সাদা রঙের ছাগল দেখা যায়। মাথা বড় কান ছোট। শিং–এর নিচের অংশ মোটা, অগ্রভাগ সরু। শরীরের ও পায়ের লোম খুব ঘন ও লম্বা। উলান ও বাঁট তেমন উন্নত নয়। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬৫–৭৫ সেমি.।

পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৩৫ কেজি, পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৩০ কেজি। শিশু বাচ্চা ছাগলের (Kid at birth weight) ২ কেজি। মাংস ও লোমের জন্য এদের পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ছাগল থেকে বছরে এক কেজি লোম পাওয়া যায়।

১৭। কামুরী (Kamori) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল পাকিস্তানের নোয়াবশাহ, দাদু, লারকানা, হায়েদ্রাবাদ এলাকায় দেখা যায়। এরা মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। লাল-বাদামি, ধূসর বাদামি, সাদা কালো রঙের ছাগলও দেখা যায়। কান লম্বা, শিং ছোট, মোটা লোম, উজ্জ্বল চোখ। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি.। সুঠাম উলান রয়েছে। উৎপাদন প্রতিশ্রুতিশীল বিধায় বিভিন্ন দেশে এই জাতের ছাগল রপ্তানি করা হয়ে থাকে, যেমন তানজিনিয়া। এই জাতের ছাগল দুধ, মাংস ও লোম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়ে থাকে।

১৮। কাশ্মীরী (Kashmiri) জাতের ছাগল

অন্যান্য নাম (ক) কাল (Kal); (খ) পশমিনা (Pashmina)।

ভারতবর্ষের কাশ্মীর এদের আদি বাসস্থান। পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে। এগুলো শীতপ্রধান দেশে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। এরা সাদা বা কালো রঙের হতে পারে। শিং লম্বা এবং পেছনের দিকে বাঁকানো। কান ছোট, খাড়া, ফানেলের মতো। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৪৬৫-৮০০ সেমি.। শরীর মোলায়েম সিল্কজাতীয় লোমে আচ্ছাদিত, এর নিচে থাকে পশমিনা। এই পশমিনা শীতে গজায় এবং বসন্তে ঝরে যায়।

পশমিনা সংগ্রহপূর্ব এক সপ্তাহ যাবৎ ছাগলটির শরীর চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে হয়, তারপর লম্বা সিল্কজাতীয় লোম কাটা হয়। এইভাবে সংগৃহীত লোমগুলো বেশ নরম। প্রতিবার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে যে পশমিনা পাওয়া যায় তা ২১-৫৬ গ্রাম এবং এর পরিমাণ বছরে প্রায় ১.৫ কেজি। এগুলো দিয়ে মূল্যবান কাপড় তৈরি হয়। সাদা লম্বা লোম দিয়ে সাধারণত দড়ি তৈরি হয়।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬০ কেজি। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫০ কেজি। একটি শিশু বাচ্চা ছাগলের (Kid) ওজন ২.২ কেজি (at birth weight)। প্রতিবারে গড়ে ১.২টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে।

২২ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। পশমিনার জন্যই এই জাতের ছাগলের দাম বেশি।

১৯। মালাবার (Malabar) জাতের ছাগল

অন্যান্য নাম (ক) মালাবারি (Malabari) ; (খ) টেলি চেরি (Telli Cherry)

এই জাতের ছাগলের আদিবাস হচ্ছে উত্তর কেরালায়। কথিত আছে যে আরব ও ভারতের ছাগলের মিশ্র বংশধর হচ্ছে মালাবার জাতের ছাগল। এই জাতের

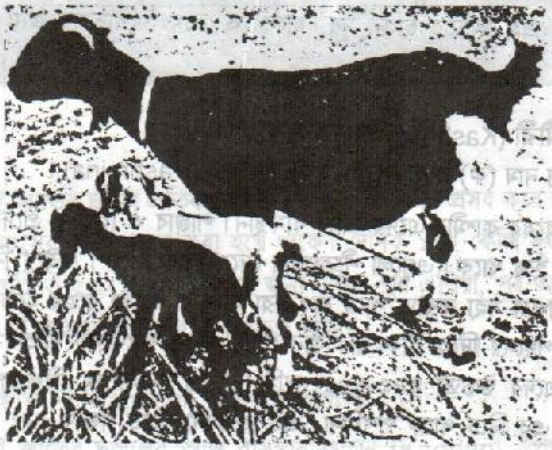

চিত্র ১১ ঃ মালাবার জাতের একটি ছাগল দুটি বাচ্চাসহ দেখানো হয়েছে

ছাগলের নির্দিষ্ট কোন রং নেই, এরা কালো হতে পারে, সাদা, বাদামি, ও চিত্রিত (Pied) বর্ণের হতে পারে কোন কোন ছাগলের শিং থাকে।

উলান বেশ উন্নত। কাঁধের মাপের পদ্ধতি অনুসারে এদের উচ্চতা ৬৫–৭৬ সেমি.। এই জাতের ছাগল গড়ে প্রতিবারে ২.১টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। বাচ্চা ছাগলের ওজন ১.৬–২ কেজি। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৪০ কেজি। পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৩৫ কেজি। প্রথম বাচ্চা দেয়ার সময় সাধারণত ২১ মাস। দুধ উৎপাদনের জন্য এদেরকে পালন করা হয়। দৈনিক এক কেজি দুধ দিয়ে থাকে। দুগ্ধকালীন ১৮০ দিনে ১৮০ কেজি দুধ দিয়ে থাকে।

২০। মারওয়ারী (Marwari) জাতের ছাগল

সৌদপুর রাজ্যের মারওয়ার নামক স্থান এই জাতের ছাগলের আদি বাসস্থান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এদেরকে দেখা যায়। এই জাতের ছাগল ঘোর কালো (Jet black) রঙের হয়ে থাকে। এদের লোম উজ্জ্বল ও লম্বা, প্রায় ১০–১২ সেমি. লম্বা হয়ে থাকে। পুরুষ ছাগলে দাঁড়ি আছে স্ত্রী ছাগলের নেই। কান ছোট। শিং আছে। উলান মোটামুটি বড়। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৫৫–৬৫ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৩০ কেজি, একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২৫ কেজি। শিশু বাচ্চা ছাগলের ওজন ২.২ কেজি। স্ত্রী ছাগল ২০ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়।

মাংস ও দুধের জন্য এ জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ০.৮ কেজি (৮০০ গ্রাম) দুধ দিয়ে থাকে।

২১। সিরোহি (Sirohi) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল ভারতের গুজরাট, সিরোহি ও পালামপুর অঞ্চলে পালন করা হয়ে থাকে। এইগুলো সাদা অথবা বাদামি কিংবা সাদা-বাদামি রঙের হয়ে থাকে। শরীর খাটো (short) লোম দিয়ে আবৃত থাকে। বছরে ২ সেমি. করে লোম বৃদ্ধি পায়। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা হচ্ছে ৫৫–৬৫ সেমি. ও পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪০ কেজি। বাচ্চা ছাগলের ওজন ২ কেজি প্রথম বাচ্চা দেয়ার বয়স হচ্ছে ১৯–২০ মাস। আধুনিক খামারে পালনের জন্য এই জাতের ছাগল বেশ উপযুক্ত (good for stall leeding) । এদের কান বড়।

এই জাতের ছাগল মাংস ও দুধের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ০.৫ কেজি। দুগ্ধদানকাল হচ্ছে ১২০ দিন এবং এই সময়ে মোট দুধ দেয় ৬৫ কেজি।

২২। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছাগলের জাতের বিবরণ

চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৃহপালিত ছাগলগুলো বন্য বেজোয়ার (Bezoar) ও মারখর (Markhor) জাতের ছাগলের সংমিশ্রণে সৃষ্টি তবে দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৃহপালিত ছাগলগুলোতে বেজোয়ার জাতের ছাগলের চারিত্রিক গুণাবলী বেশি পরিলক্ষিত হয়।

তিব্বত, সিংহাই (Tsinghai) ও মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীগণ দুধ, মাংস,

চামড়া ও লোমের জন্য একসাথে অনেক ছাগল পালন করে থাকে; পক্ষান্তরে দক্ষিণ চীনের লোকেরা মাংসের জন্য অল্প সংখ্যক ছাগল পালন করে থাকে।

২৩। ক্যাটজাং (Katjang) জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় ছাগলের জাত। এই জাতের ছাগল ফিলিপাইনেও দেখা যায়। এই ছাগল সাধারণত কালো রঙের তবে

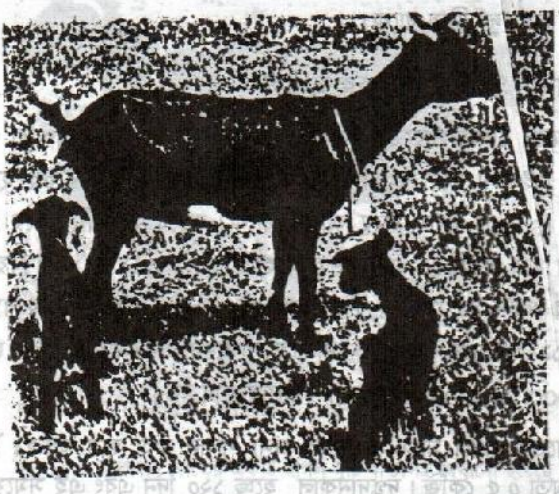

চিত্র ১২ ঃ একটি ক্যাটজাং ছাগলের সাথে দুটি বাচ্চা দেখা যাচ্ছে

সাদা সাদা দাগবিশিষ্ট ছাগলও দেখতে পাওয়া যায়। শিং ছোট খড়্গের মতো (scimitar shape)। কান ছোট ও খাড়া। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে তবে স্ত্রী ছাগলের কদাচিত। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৫৬–৬৫ সেমি.।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। বাচ্চা ছাগলের ওজন ১.৫ কেজি, অল্পবয়সে বাচ্চা দেয়। প্রথম বাচ্চা দেয়ার বয়স ১৫–১৬ মাস প্রতিবারে বাচ্চা দেয়ার সংখ্যা (Litter size) ১.৭টি। চিত্র একটি ক্যাটজাং (Katjang) ছাগলের সাথে দুটি বাচ্চা দেখা

যাচ্ছে। সাধারণত মাংসের জন্য এই জাতের ছাগল পালন করা হয়। প্রতিটি ছাগল থেকে মানুষের খাদ্য উপযোগী দ্রব্য প্রাপ্তির পরিমাণ ৬১%। নাড়িভূঁড়ি ছাড়া মাংস ও হাড় পাওয়া যায় ৪৫–৫১%। মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য পাওয়া যায় ৮২%। এই জাতের ছাগলের চামড়া কুটির শিল্পের দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এরা খুব কম দুধ দেয়। এই জাতের ছাগলের সাথে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেক সময় ছাগল যে দুধ দেয় তা দিয়ে প্রসবকৃত বাচ্চাদের ভরণ পোষণই হয় না।

২৪। মা টও (Ma tou) জাতের ছাগল

চীনে হুপেহ (Hupeh) প্রদেশে এই জাতের ছাগল পাওয়া যায়। সেখানকার জলবায়ু কিছুটা গরম। এটি লম্বা পাবিশিষ্ট সাদা ছাগল। কান ছোট ও খাড়া, শিং নেই। কাঁধের মাপ পদ্ধতি এদের উচ্চতা ৪৫–৬৫ সেমি.। প্রতিবারে গড়ে ২.২টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এই জাতের ছাগল দুধ ও মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ১.৫ কেজি দুধ দেয়।

চিত্র ১৩ ঃ শ্রীলঙ্কার স্থানীয় স্ত্রী ছাগল

২৫। সাউথ-চীনা (South China) জাতের ছাগল

অন্য নাম Dog Goat

বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ক্যাটজাং

(Katjang) ছাগলের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে উচ্চতা ৫০–৫০ সেমি.। সাধারণত প্রতিবারে দুটি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। কালো রং। ছোট খাড়া কান, বামন (dwarf) জাতের ছাগল মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে।

২৬। শ্রীলঙ্কার স্থানীয় জাতের ছাগল

এই জাতের ছাগল সাধারণ সাদা তবে কালো সাদা দেখা যায়। শিং আছে, কান ছোট ও খাড়া। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ২৩–২৪ কেজি। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬০–৬৫ সেমি.। বাচ্চা ছাগলের ওজন ১.২৯ কেজি।

চিত্র ১৩ ও চিত্র ১৪ যথাক্রমে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ ছাগলের ছবি দেয়া হলো

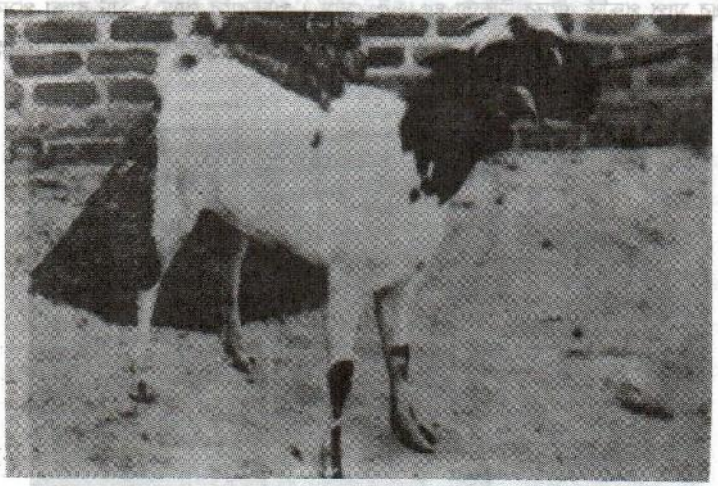

চিত্র ১৪ ঃ শ্রীলঙ্কার স্থানীয় পুরুষ ছাগল

এখানে উল্লেখ্য, যেসব লোক এশিয়া থেকে আফ্রিকায় বসবাস করতে গিয়েছিলেন তারাই এশিয়া থেকে ছাগল আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আফ্রিকায় প্রায় ৭০ জাতের (breeds) ছাগল রয়েছে।

২৭। নিউবিয়ান (Nubian) জাতের ছাগল

এদের আদি বাসস্থান সুদানে হলেও আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। সিরিয়ান ছাগলের মতো কান, ছোট সিল্কজাতীয়

লোম। এরা বিভিন্ন রঙের হতে পারে তবে লাল, কালো ও বাদামি রঙের ছাগল বেশি দেখা যায়। কাঁধের মাপ অনুসারে এদের উচ্চতা ৭০-৮০ সেমি.। আফ্রিকায় এটিই একমাত্র জাত, যা দুধ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। উলান সুঠাম। দৈনিক ১.২ কেজি দুধ দেয়। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশে এই জাতীয় ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

চিত্র ১৫ ঃ নিউবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র ১৫-এ ভেনিজুয়েলার এই জাতের একটি স্ত্রী ছাগলের ছবি দেখানো হলো।

২৮। সুদান ডেজার্ট (Sudan Desert) **জাতের ছাগল**

সুদান মরু অঞ্চলের জন্য এই জাতের ছাগল বেশ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার অন্যান্য শুষ্ক (Arid) অঞ্চলেও এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। মাঝারি থেকে বড় আকারের লম্বা পা, মসৃণ চামড়া (fine cout) এবং শুষ্ক এলাকায় খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা ইত্যাদির জন্য এদেরকে সাহিল (Sahel) বা মরুভূমির ছাগল (Desert goats) বলা হয়ে থাকে।

সুদান ডেজার্ট জাতের ছাগলের রং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন– সাদা, ধূসর, লাল বা কালো, যা থেকে অনুমতি হয় যে, এটি অনেক ছাগলের মিশ্র জাত। তবে সাদা ও কালো ডোরা-কাটা ছাগলের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। শরীরে ছোট মসৃণ লোম রয়েছে। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে, স্ত্রী ছাগলের কদাচিত দাঁড়ি দেখা যায়। শিং রয়েছে এবং তা খাড়া ও পেছনের দিকে হেলানো। শিং ৩০–৩৫ সেমি. লম্বা হয়ে থাকে। কান লম্বায় ১২–২০ সেমি.। কাঁধের মাপের পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬৫–৮০ সেমি.। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৩৮ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৩৩ কেজি।

এই জাতের ছাগল বেশ উৎপাদনশীল (prolific)।

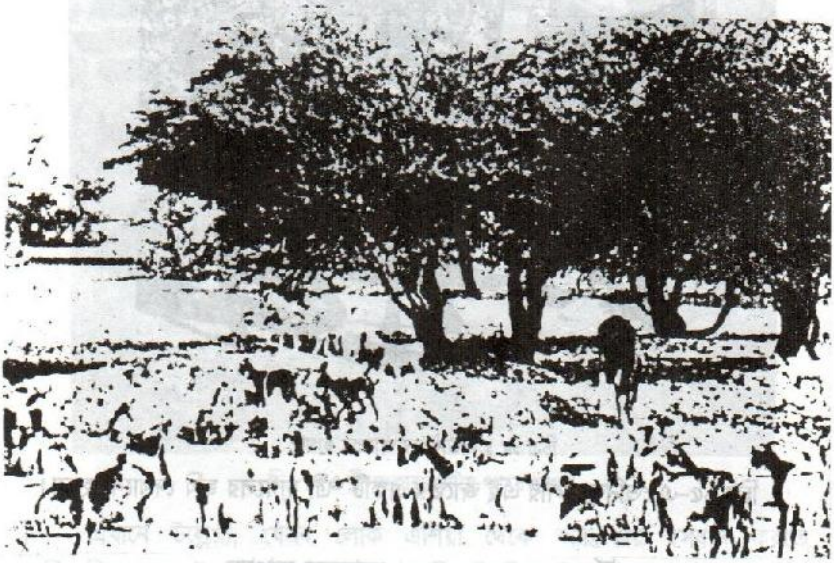

চিত্র ১৬ ঃ সুদানের মরুভূমিতে সুদান ডেজার্ট ছাগল চড়ানোর দৃশ্য

মাংস ও চামড়ার জন্য সুদান ডেজার্ট জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। গড়ে ৪৯% মাংস ও হাড় (মানুষের খাদ্য উপযোগী) পাওয়া যায়। মরুভূমিতে এই জাতের ছাগল চড়ানোর দৃশ্য চিত্র ১৬তে দেখানো হয়েছে।

২৯। রেড সোকুটু (Red Sokoto) জাতের ছাগল

রেড সোকুটু জাতের ছাগলের অন্য নাম হচ্ছে মারাদি (Maradi)।

এই জাতের পুরুষ স্ত্রী উভয় ছাগলই ঘন লাল রঙের (dark red colour) হয়ে থাকে, যা এটির প্রসিদ্ধির একটি কারণ। এটি নাইজেরিয়ার সোকুটু প্রদেশে ও নাইজারে দেখা যায়। এটি পশ্চিম আফ্রিকার লম্বা পাবিশিষ্ট ছাগলের সাথে একই অঞ্চলের বামন ছাগলের প্রজননে সৃষ্ট সঙ্কর জাতি। কাঁধের মাপ পদ্ধতি অনুসারে এদের উচ্চতা গড়ে ৬৫ সেমি.। এগুলো শুষ্ক অঞ্চলে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এদের শিং আছে। শিং খড়গের মতো। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি।

চিত্র ১৭ঃ একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী সোকুটু ছাগল দেখানো হয়েছে। • চিহ্নিত ছাগলটি পুরুষ (পাঠা)

স্ত্রী ছাগল প্রতিবার গড়ে ১.৫টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে (Litter size ১.৫)। এই জাতের ছাগলের চামড়ার মূল্য খুব বেশি। ছাগলের চামড়ার মধ্যে এইজাতের ছাগলের চামড়ার দাম সবচেয়ে বেশি। চামড়া ও মাংসের জন্য এইজাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

৩০। পশ্চিম আফ্রিকার বামন জাতের ছাগল (West African Dwarf)

পশ্চিম আফ্রিকার বামন জাতের ছাগল বিভিন্ন জাতের হতে পারে। বিভিন্ন স্থানে এই জাতের ছাগলের নামও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এদের অন্যান্য নাম হলো —

(ক) ক্যামেরুন বামন (Cameroon Dwarf)

(খ) ফাউটা জেল্লন (Fouta Djallon)

(গ) কিরডি (Kirdi) বা কিরদিমি (Kirdimi)

(ঘ) নাইজেরিয়ান বামন (Nigerian Dwarf)

এই জাতের ছাগল পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় দেখা যায়। এগুলো পূর্ব-উত্তর পূর্ব

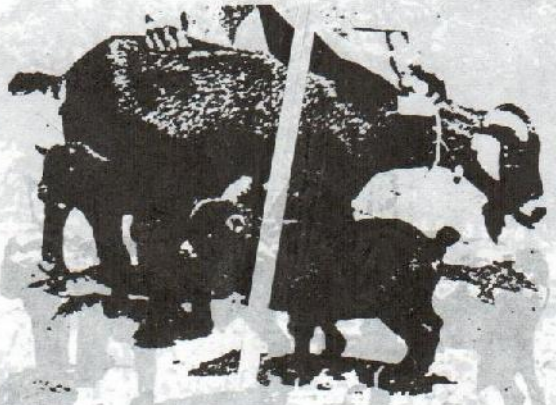

চিত্র ১৮ঃ পশ্চিম আফ্রিকার বামন জাতের ছাগল দুটি বাচ্চাসহ দেখানো হয়েছে

আফ্রিকা থেকে এসেছে বলে অনেকের বিশ্বাস। কারণ এই জাতের ছাগল এখনও সোমালিয়াতে দেখা যায়। এই ছাগলগুলোর পূর্বপুরুষ পারস্যে *Capra hircus* নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এই *Capra hircus* জাতের ছাগলগুলোকে সিরিয়া থেকে মিশরে আনা হয়েছিল। মিশর, সোমালিয়া ও সুদান থেকে এই জাতের ছাগল পশ্চিম আফ্রিকার সাভানা (savanna), আর্দ্র ও বনাঞ্চলে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

৩১। বান্টু জাতের ছাগল (Bantu goats)

এটি একটি অনুন্নত জাতের ছাগল। বান্টু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই জাতের ছাগল পালন করে থাকে। এদেরকে মালাবি, জাম্বিয়া, বতসোয়না, জিম্বাবুই, দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যায়। কাঁধ মাপের পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬০–৬৫ সেমি., লোম বেঁটে শিং আছে, পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৩০ কেজি। পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ২৫ কেজি। মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। একটি ছাগল থেকে মাংস এবং হাড় (মানুষের খাদ্য উপযোগী অংশ) ৫৭% পাওয়া যায়। তবে বিক্রয়যোগ্য ৮১% ও খাদ্যযোগ্য ৭৫% দ্রব্য এই জাতের ছাগল থেকে পাওয়া যায়।

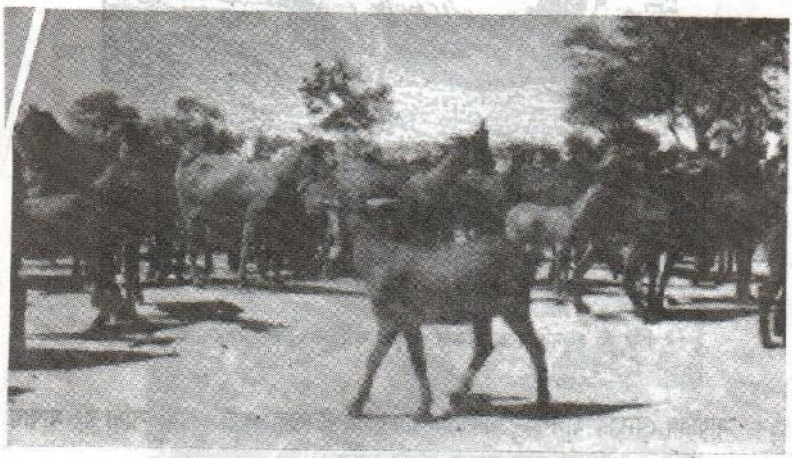

চিত্র ১৯ ঃ রেড সুকুটি (উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়া)

দক্ষিণ আফ্রিকার ছাগলকে দুভাগে ভাগ করা যায়–

১। লম্বা পা, বড় ঝোলানো কান নিউবিয়ান ছাগলের সাথে সাদৃশ্য আছে।

২। ছোট পা, অপেক্ষাকৃত ছোট কান।

উপরোক্ত উভয় দলেরই শিং থাকতে পারে। কালো, সাদা, বাদামি কিংবা ধূসর বর্ণের হতে পারে।

৩২। বোয়ার (Boer) জাতের ছাগল

অন্য নাম হচ্ছে আফ্রিকানডার (Africander)।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার (Boer) জাতের ছাগল হোটেনটট (Hott'entot) অথবা বান্টু (Bantu) জাতের ছাগল থেকে উৎপত্তি। তিন ধরনের বোয়ার (Boer) জাতের ছাগল রয়েছে —

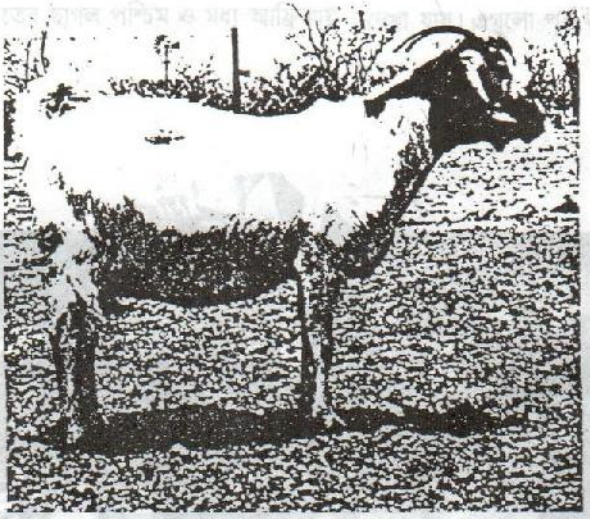

চিত্র ২০ : দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার জাতের ছাগল দেখানো হয়েছে

১। সাধারণ বোয়ার ছাগল – মাঝারি আকৃতির, উজ্জ্বল ছোট লোম, সাদা রং মাথায় ও গলায় বাদামি বা লাল রঙের ফোঁটা থাকে।

২। লম্বা লোম, বড় সুঠাম দেহ, দেরিতে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে।

৩। বিভিন্ন রঙের শিং ছাড়া দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।

অনেক বছর ধরে নির্বাচিত প্রজন্মের মাধ্যমে বোয়ার জাতের ছাগলের জাত

উন্নত করা হয়েছে। এগুলোর গায়ের রং সাদা, গলা ও মাথা লাল রঙের হয়ে থাকে (চিত্রে তা দেখা যাচ্ছে)। বড় শিং, ঝুলন্ত বড় আকারের কান, প্রজনন ক্ষমতা (fertility) খুব ভাল। শতকরা ৫০ ভাগ ছাগল ২টি, সাত ভাগ ছাগল ৭টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। দানাদার খাদ্য দিয়ে (zero grazing) পালন করা যায়, তবে লতা-পাতা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এই জাতের ছাগলের প্রজনন ক্ষমতা (sexual activity) শরৎকালে বেশি থাকে । এদেরকে মাংস, দুধ ও চামড়ার জন্য পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ১.২ থেকে ১.৮ কেজি দুধ দেয়। দুগ্ধদানকালীন ১২০ দিনে ১৬০ কেজি দুধ দেয়। দুধে ননীর উপস্থিতি ৫.৬%। মাংস ও হাড় (মানুষের খাদ্য উপযোগী) প্রাপ্তির পরিমাণ ৪৯ – ৫৫% (dressing percentage) । উন্নত মানের চামড়া বাচ্চা ছাগল থেকে পাওয়া যায়।

আমেরিকার ছাগল

৩৩। ক্রাইওল্লা (Criolla) জাতের ছাগল

অন্য নাম ক্রিওলি (Creole)

এই জাতের ছাগলের আদি বাস হচ্ছে স্পেন দেশে। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। ক্রাইওল্লো (Criollo) ছাগলের সাথে

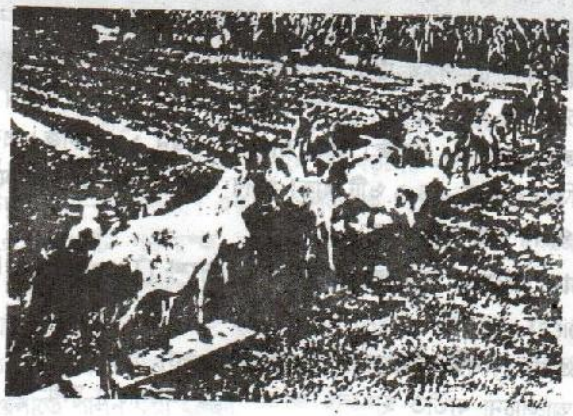

চিত্র ২১ ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিভিন্ন জাতের ও ধরনের ছাগল একই সাথে চড়ানো হচ্ছে

মালয়েশিয়ার ও ইন্দোনেশিয়ার ক্যাটজাং (katjang) ও চীনের মা টও (Ma Tou)

ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমানে উন্নত জাতের আমদানি করা ছাগলের সাথে এর প্রজনন করানো হচ্ছে।

এই জাতের ছাগল সাধারণত কালো অথবা বাদামি রঙের হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সাদা-ডোরা কাটা ছাগল দেখা যায়। পাতলা চামড়া, মোটা লোম (coarse hair) খড়্গের মতো শিং। স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর ছাগলেরই শিং থাকে। কান ছোট ও খাড়া। পুরুষ ছাগলের দাঁড়ি থাকে স্ত্রী ছাগলের কদাচিত দাঁড়ি দেখা যায়। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি.। মাংসের জন্য এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে। দুধ উৎপাদন খুবই কম অর্থাৎ মাত্র দৈনিক ০-৩ কেজি দিতে সক্ষম।

৩৪। মক্সোটু (Moxoto) জাতের ছাগল

অন্য নাম ব্ল্যাক ব্যাক (Black Back)

উত্তর-পূর্ব ব্রাজিল এদের জন্মস্থান। এগুলো বাদামি রঙের হয়ে থাকে। পিঠে কালো ডোরা থাকে যার জন্য এদেকে ব্ল্যাক ব্যাক নামকরণ করা হয়ে থাকে। পেট ও মুখ কালো রঙের হয়ে থাকে। মাংস ও চামড়ার জন্য এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে।

৩৫। ফিজি (Fiji) জাতের ছাগল

ফিজির এটি স্থানীয় ছাগল আকারে ছোট, লোম ছোট। তবে কষ্টসহিষ্ণু। শরীরের রং মালয়েশিয়ার ক্যাটজাং (katjang) ছাগলের মতো সাদা, কালো, বাদামি ও ধূসর রঙের সংমিশ্রণ। স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগলেরই শিং রয়েছে। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৫৮-৬৬ সেমি.। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫ কেজি, স্ত্রী ছাগলের ওজন ২০ কেজি। বাচ্চা ছাগলের ওজন ২.৪ কেজি। এরা প্রজননে সেরা। প্রতিবারে গড়ে ১.৪-১.৬টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। প্রধানত মাংসের জন্য এদেরকে পালন করা হয়ে থাকে।

শীতপ্রধান দেশের ছাগল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (Temperate breeds in the tropics)

শীতপ্রধান দেশের ছাগল (Temperate breed) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (tropics) সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত ছাগলের জাত সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শীতপ্রধান দেশের উল্লেখযোগ্য যেসব ছাগল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সফলতার সাথে পালন করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে —

আলপাইন (alpine), এ্যাংগলো নিউবিয়ান (Anglo nubian), টুগেনবারগ (Toggenburg) ও সানেন (Saanen) সারণি ৬-এ উপরোক্ত জাতের ছাগলের কিছু তথ্য দেয়া হলো।

৩৬। অ্যালপাইন (Alpine) জাতের ছাগল

এটি ইউরোপের উল্লেখযোগ্য ছাগলের জাত। মাঝারি আকারের ছাগল, খাড়া কান, লম্বা লোম, বিভিন্ন রঙের হতে পারে, তবে সাদা কালো রঙের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ২২ ঃ অ্যালপাইন ছাগলের নমুনা দেখানো হলো

শিং থাকতে পারে যদি থাকে তা হলে তা খড়্গের মতো। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৭৫-৮০ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬৫ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৬০ কেজি । দুধ ও মাংসের জন্য এদের পালন করা হয়ে থাকে। গড়ে দৈনিক ০.৯-১.৩ কেজি দুধ দেয়। এক দুগ্ধদানকালীন ২০৯ দিনে ২৭৪ কেজি দুধ দেয়। দুধে ননীর উপস্থিতি ৩.৬%। এই জাতের ছাগল ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভেনিজুয়েলাতে পালন করা হচ্ছে।

সারণি ৬ ঃ শীতপ্রধান দেশ থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমদানি করা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাগলের কিছু তথ্য

জাতের নাম (Breed)	আদি বাসস্থান (Country of origin)	কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে উচ্চতা (সেমি.)	জীবন্ত ওজন গড়ে (কেজি)	কি জন্য পালন করা হয়	গ্রীষ্মমণ্ডলে দুধ উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি)
অ্যালপাইন (Alpine)	সুইজারল্যান্ড	৭৫–৮৫	৬০–৬৫	দুধ	০.৯–১.৩
এ্যাংগলো নিউবিয়ান Anglo Nubian	ইংল্যান্ড	৮০–১০০	৬০–৭০	দুধ/মাংস	০.৮–১.২
টুগেনবারগ (Toggenburg)	সুইজারল্যান্ড	৬৫–৭৫	৬০–৬৫	দুধ	১.০
সানেন (Saanen)	সুইজারল্যান্ড	৭৫–৯০	৬৫–৭০	দুধ	১–৩.০

৩৭। এংগলো নিউবিয়ান (Anglo-Bubian) জাতের ছাগল

নিউবিয়ান জাতের ছাগল যেমন, যমুনাপারী এবং জারাইবি (Jamunapari and Zaraibi) ও ইংলিশ জাতের ছাগলের সাথে প্রজননের মাধ্যমে এ্যাংগলো নিউবিয়ান (Anglo-Nubian) জাতের ছাগলের সৃষ্টি।

চিত্র ২৩ ঃ এ্যাংগলো নিউবিয়ান স্ত্রী ছাগল

চিত্র ২৪ ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমদানীকৃত এ্যাংগলো নিউবিয়ান স্ত্রী ছাগল

৩৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমদানিকৃত এ্যাংগলো নিউবিয়ান স্ত্রী ছাগল

আকৃতি ও উৎপাদনে এই জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এরা বিভিন্ন রঙের হতে পারে। তবে সাদা ও বাদামি রঙের সংখ্যা বেশি। কান লম্বা। সাধারণত শিং নেই। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৭৫–১০০ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৭০ কেজি, স্ত্রী ছাগলের ওজন ৬০ কেজি। শীতপ্রধান দেশের জাত হলেও গ্রীষ্মমণ্ডলে এরা বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই জাতের ছাগল সফলভাবে পালিত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, মৌরিতানিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফিজি, ভেনিজুয়েলা ও ভারতে। মাংস ও দুধ উৎপাদনের জন্য এদের পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক ০.৮–১.২ কেজি দুধ দেয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রতি দুগ্ধদানকালীন ৩০০ দিনে ২৫০–৩০০ কেজি দুধ দিয়ে থাকে। দুধে ননীর উপস্থিতি ৪.৫৮।

৩৯। টুগেনবারগ (Toggenburg) জাতের ছাগল

উত্তর-পূর্ব সুইজারল্যান্ডের টুগেনবারগ উপত্যকায় এদের আদি বাসস্থান। এদের গায়ের রং বাদামি অথবা চকলেট রঙের। মুখমন্ডলে বিশেষ করে চোখের সামনে, চিবুক (ramp) ও লেজ সাদা রঙের হয়ে থাকে। পায়ের হাঁটুর নিচের অংশটিও সাদা থাকে। এদের শিং থাকতে পারে। পুরুষ ছাগলের লোম স্ত্রী ছাগলের লোম থেকে লম্বা। স্ত্রী ছাগলের চামড়া নরম ও মোলায়েম।

চিত্র ২৫ ঃ একজোড়া টুগেনবারগ ছাগল দেখানো হয়েছে

বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই জাতের ছাগল খাপ খাইয়ে নিতে পারে বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশে সফলভাবে এদের পালন করা হচ্ছে। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৬৫–৭৫ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫০ কেজি ও একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬৫ কেজি। স্ত্রী ছাগল বড় আকারের হয়ে থাকে। দুধ উৎপাদনের জন্য এই জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। দৈনিক দুধ উৎপাদন ১ কেজির বেশি। এক দুগ্ধকালীন (Per Laetation period) ২৬৩ দিনে ৫৩০ কেজি দুধ দিয়ে থাকে তবে তানজানিয়া ও ভেনিজুয়েলায় দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

৪০। সানেন (Saanen) জাতের ছাগল

পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সুইজারল্যান্ড এদের আদি বাসস্থান। এগুলো বড় আকারের ছাগল। গায়ের রং সাদা অথবা বিস্কুট রঙের হতে পারে। নাক, কান ও

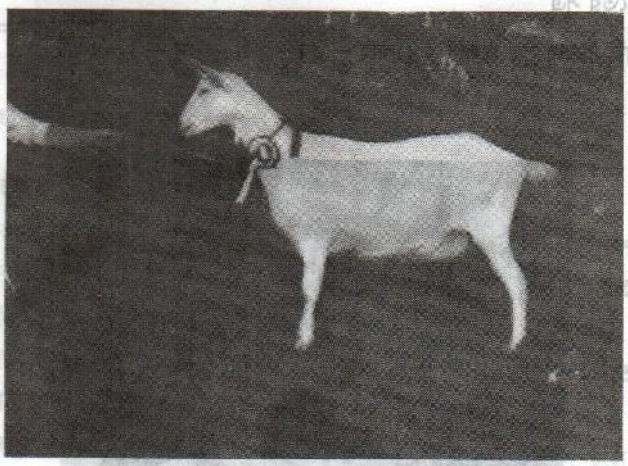

চিত্র ২৬ ঃ জাপানের সানেন জাতের ছাগল

উলানে কালো দাগ থাকতে পারে। কান উপরের দিকে, খাড়া। লোম ছোট। উলান বেশ বড়, দেখলেই মনে হয় দুধালো ছাগল। কাঁধের মাপ পদ্ধতিতে এদের উচ্চতা ৭৫–৯০ সেমি.। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৭৫ কেজি এবং স্ত্রী ছাগলের ওজন

৬৫ কেজি। এই জাতের ছাগল কড়া সূর্যের আলো সহ্য করতে পারেনা। ছায়া এদের পছন্দ।

এই জাতের ছাগল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সাইপ্রাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনিজুয়েলা ও ভারতে পালন করা হচ্ছে। এরা গ্রীষ্মমণ্ডলে দৈনিক ১-৩ কেজি ও শীতপ্রধান দেশে ৫ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। এটি দুগ্ধদানকালীন ৩৩০ দিনে ১০০০ কেজি দুধ উৎপাদনের রেকর্ড (ইসরাইলে) রয়েছে। দুধে ননীর উপস্থিতি ৩.৫%।

ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করা

ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণের একটা নিয়ম প্রচলিত আছে। যদি এই পদ্ধতি দিয়ে ছাগলের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা যায় না তথাপি আনুমানিক একটা বয়স ধারণা করা যায়।

দুধ দাঁত বা অস্থায়ী দাঁতের সূত্র হলো –

২ (আই $\frac{০}{৩}$ সে $\frac{০}{১}$ প্রি $\frac{৩}{৩}$) = ২০টি

দাঁতের সূত্র

স্থায়ী দাঁতের সূত্র হলো ২ (আই $\frac{০}{৩}$ সে $\frac{০}{১}$ প্রি $\frac{৩}{৩}$ মু $\frac{৩}{৩}$) = ৩২টি

চিত্র ২৭ঃ ছাগলের মাড়ির অস্থায়ী/দুধ দাঁত। (বয়স – ৯ মাস)

চিত্র ২৮ ঃ ছাগলের মাড়ির দাঁত (এক থেকে দেড় বছর)

এক্ষেত্রে,

আই = কর্তন (Incesors) দাঁত বা কর্তন দাঁত,

সে = সেন্ট্রাল (Centrals) দাঁত,

প্রি = অগ্রপেষণ দাঁত (Pre-molars) দাঁত,

মু = পেষণ (molars) দাঁতস।

উল্লেখ্য, ছাগলের ১ সপ্তাহ বয়সে দুধ ও কর্তন দাঁত (Incisors) উঠে।

বয়স্ক ছাগলের দাঁতের অবস্থা

ছাগলের বয়স যখন প্রায় ৪ সপ্তাহ তখন তিন জোড়া অস্থায়ী বা দুধ অগ্রপেষণ দাঁত উঠে। পরে ১.৫ – ২.০ বছর বয়সে তিন জোড়া দুধ অগ্রপেষণ দাঁত পড়ে যায় এবং তিন জোড়া স্থায়ী অগ্রপেষণ দাঁত উঠে।

প্রথম জোড়া পেষণ দাঁত উঠে ৩–৫ মাস বয়সে এবং দ্বিতীয় জোড়া পেষণ দাঁত উঠে ৯–১২ মাস বয়সে।

তৃতীয় জোড়া পেষণ দাঁত উঠে ১.৫–২.০ বছর বয়সে। চার বছর বয়স হলে কর্তন (incisors) দাঁতগুলোর মূল মাড়ি থেকে বের হয়ে (protrude) আসতে থাকে।

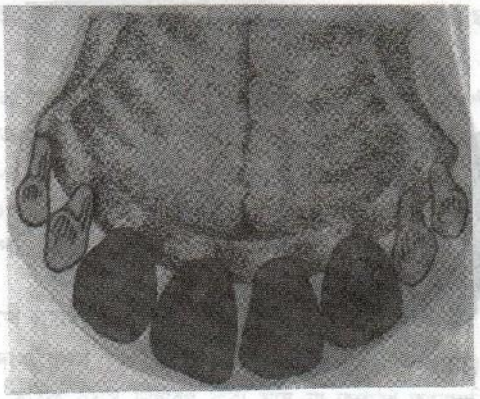

চিত্র ২৯ ঃ ছাগলের মাড়ির দাঁত (এক থেকে দেড় বছর)

চিত্র ৩০ ঃ ছাগলের মাড়ির দাঁত (আড়াই থেকে তিন বছর)

চিত্র ৩১ঃ ছাগলের মাড়ির দাঁত (তিন থেকে চার বছর)

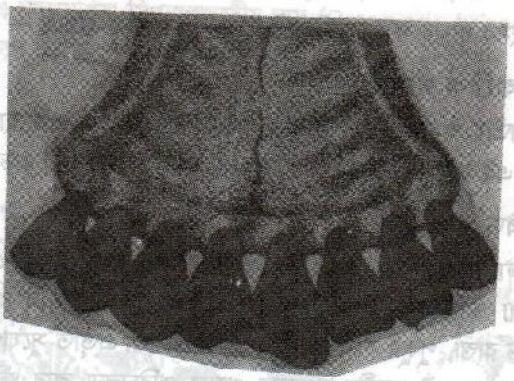

চিত্র ৩২ঃ বয়স্ক ছাগলের দাঁতের অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

খামার ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান

ছাগলের খামার ব্যবস্থা

ছাগলের খামার চার ধরনের হতে পারে, যেমন —

১। পারিবারিক খামার (Subsistence Farming)

২। অনিবিড় খামার (Extensive Farming)

৩। নিবিড় খামার (Intensive Farming)

৪। আধা-নিবিড় খামার (Semi-intensive Farming)

৫। বাগানে ছাগল পালন (Integration into crop cultivation)

নিচে এইসব খামার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে —

১। পারিবারিক খামার

এই জাতীয় খামার নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য ৩-৪টি ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। এই জাতীয় খামার থেকে যে আয় হয় তা সংসারের বাড়তি আয়।

২। অনিবিড় খামার

এই জাতীয় খামারে ৮-১০টি ছাগল পালন করা হয়। যেসব পরিবারে চাষাবাদযোগ্য জমি নেই, অথচ চাষাবাদ অনুপযোগী উঁচু জমি রয়েছে, এবং যে এলাকায় বড় রাস্তা, পুকুর-দীঘির পাড়, পাহাড়ী এলাকা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেইসব এলাকায় এই জাতীয় ছাগলের খামার পরিচালনা করে জীবন ধারণ করা সম্ভব। এই জাতীয় খামার পরিচালনা করতে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, বেশি পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না, তবে বন্য প্রাণীর হাত থেকে ছাগলেকে বাঁচানোর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করতে হয়। বাংলাদেশের বাজারে ছাগলের মাংসের ৭০ শতাংশই আসে এই জাতীয় খামার থেকে। নাইজেরিয়া, সুদান, ভেনিজুয়েলা ও কোন কোন আরব দেশেও এই জাতীয় খামার চালু রয়েছে।

৩। নিবিড় খামার

এই ব্যবস্থা এমন একটি খামার ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে

স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় ছাগলের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি, বাসস্থান সব কিছুই সরবরাহের দায়িত্ব খামার মালিককে নিতে হয়। মাঠে চড়িয়ে (grazing) খাওয়ানোর ব্যবস্থা (zero grazing) এই জাতীয় খামারে থাকে না। এই জাতীয় খামার পরিচালনা করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে খামার পরিচালনা করতে পারলে এই জাতীয় খামারে ছাগলের রোগ-বালাই কম হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা সহজ। তবে সুষ্ঠুভাবে খামার পরিচালনা করতে না পারলে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে এই জাতীয় খামার বেসরকারিভাবে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। তবে এই দেশে আমিষ খাদ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা দূর করতে হলে সরকারি খামারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও এই জাতীয় খামার স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ছাড়া অল্প সময়ের মধ্যে ছাগলের জাত উন্নয়ন, সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। জমির স্বল্পতার জন্য ঘাস চাষ করে চড়িয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতেও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে না তবে ঘাস না খাওয়ানোর (zero grazing) ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

চিত্র ৩৩-এ মালয়েশিয়া সিগনালজাতীয় ঘাস (*Brachiaria brizentha*) চাষ করা জমিতে ছাগল চড়তে দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৩৩ ঃ সিগনালজাতীয় ঘাস চাষ করা জমিতে ছাগল চড়ানোর দৃশ্য

মালয়েশিয়ার ক্যাটজাং ছাগলকে তার ইচ্ছামাফিক গিনি ঘাস (*Panicum maximum*) খাওয়ানোর ফলে ছাগলের ওজন প্রতিদিন বেড়েছে ২৬ গ্রাম এবং প্রয়োজনীয় গিনি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাইয়ে ওজন বেড়েছে ৭৬ গ্রাম। জ্যামাইকায় সেচের মাধ্যমে প্যাংগোলা ঘাস (*Digitaria decumbens*) চাষ করে তাতে প্রতি হেক্টরে ৩৭-৪৫টি ছাগল চড়ানো হয় এবং মাঠের মধ্যেই প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয়।

ছাগলকে সাধারণত চাষ করে যেসব ঘাস খাওয়ানো হয় এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —

১। নেপিয়ার (Napier, *Pennisetum purpureum*)

২। গিনি (Guinea, *Panicum maximum*)

৩। প্যাংগোলা (Pangola, *Digitaria decumbens*)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খামারের ছাগলকে নিম্নলিখিত দ্রব্য খাওয়ানো হয়-

(ক) ধানের খড় (Rice straws, *Oryza sativa*)

(খ) চালের কুঁড়া (Rice bran, *Oryza sativa*)

(গ) মিষ্টি আলুর গাছ বা লতা-পাতা (Vines of sweet potato, *Ipomoea batatas*)

(ঘ) বাদাম গাছ বা লতা-পাতা (Vines, *Arachis hypogaea*)

(ঙ) কাঁঠাল গাছের পাতা (Jack Fruit leaves, *Artocarpus integrifolia*)

(চ) ক্যাসাভা (Cassava, *Mamhot esculenta*)

(ছ) আখের পাতা ও ডগা (Sugarcane leaves & tops).

৪। ছাগলের আধুনিক খামার

এই জাতীয় খামার স্থাপনের জন্য পতিত উঁচু জমি, টিলা এবং যেসব স্থানে অন্য কোন ফসল ফলানো লাভজনক নয় সেইসব স্থানই উপযুক্ত। খামারটিকে এমনভাবে বেড়া দিয়ে নিতে হবে, যাতে বন্যপ্রাণী খামারে ঢুকে ছাগলের কোন ক্ষতি করতে না পারে। ছাগল যাতে সকাল-বিকাল চড়ে খেতে পারে খামারে সেই রকম ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অথবা অন্যান্য বালক-বালিকাও বিকালে ২-৩ ঘন্টা ছাগলগুলোকে মাঠে চড়িয়ে

আনতে পারে। তবে এইজাতীয় খামারে ছাগলকে প্রয়োজনমাফিক দানাদার খাদ্য ও পানি সরবারাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাতে থাকার জন্য ঘর তৈরি করতে হবে। এই জাতীয় খামারে ছাগলের কাঁচা ঘাসের চাহিদা মেটানোর জন্য প্যাংগোলা ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০-৬৫টি ছাগল পালন করা যেতে পারে।

৫। বাগানে ছাগল পালন

এই ব্যবস্থা আধুনিক, আধা-আধুনিক, ছোট খামার কিংবা পারিবারিক খামার ব্যবস্থা হতে পারে। যেসব বাগানে ছাগল পালন করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে—

১। নারকেল গাছের বাগান
২। সুপারি গাছের বাগান
৩। তাল গাছের বাগান
৪। রাবার গাছের বাগান
৫। আম গাছের বাগান
৬। কাঁঠাল গাছের বাগান ও
৭। পেয়ারা গাছের বাগান

শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল আশাব্যঞ্জক। এই জাতীয় খামারে ছাগল পালন করে লাভবান হতে হলে কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে ,যেমন —

১। প্রস্তাবিত বাগানে যথেষ্ট ঘাস বা তৃণলতা কিংবা পাতা রয়েছে কিনা?
২। এইসব ঘাস বা তৃণ-লতা বা পাতা ছাগলের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কিনা?
৩। অনিষ্টকারী ঘাস, লতা-পতা ইত্যাদি সম্ভব হলে সরিয়ে আগাছার মতো বাছাই করে নিতে হবে।
৪। সম্ভব হলে বাগানের এইসব ঘাস, তৃণ-লতা পাতার পুষ্টিমান জেনে নিতে হবে।
৫। বাগানের আয়তনের উপর নির্ভর করে ছাগলের সংখ্যা ঠিক করতে হবে এবং চড়াতে (grazing) হবে।
৬। বাগানে কোন সময় ছাগল চড়ানো নিরাপদ, সুবিধাজনক তা ঠিক করে সঠিক সময়ে ছাগল চড়াতে হবে।

৭। ছাগল চড়াতে গিয়ে যাতে মূল ফসলের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

ফিজিতে বসবাসকারী ভারতবাসীরা আখক্ষেত এলাকায় প্রায় দেড় লক্ষ ছাগল পালন করে থাকে যা সে দেশের মোট ছাগলের শতকরা ৭০ ভাগ। যখন আখ মাড়াই শেষ হয়ে যায় তখন এইগুলো পাহাড়ী এলাকায় চড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

সারণি ৭ঃ মালয়েশিয়ার রাবার ও নারকেল বাগানে ছাগলের খাদ্য হিসেবে প্রাপ্ত ঘাসের বিভিন্ন উপাদানের শতকরা হার

বাগানের নাম	শুষ্ক পদার্থ উৎপাদনের পরিমাণ (D. M. Production)	পূর্ব পরিপাক আমিষ (On the basis of DM.)	কোন উপাদান কতটা পাওয়া যায়
রাবার বাগান	৪৮০–৫০০ কেজি/হেক্টর	১৪–১৬%	ঘাস ৮২% তৃণলতা ১%
	ফার্ণ ৩%		লতা–পাতা ১৪%
নারকেল বাগান	৮০০–১২০০ কেজি/ হেক্টর	৮–১২%	ঘাস ৭০–৮০%
			ফার্ন লতা–পাতা ৩০–২০%

রাবার, নারকেল, সুপারি, তালবাগানে ও অন্যান্য বাগানে ছাগল চড়ানোর উপকারিতা

১। ছাগলের গোবর ও চনা বাগানের মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়।

২। অবাঞ্ছিত বন্য তৃণ ও লতা-পাতা দমন করা যায়।

৩। আকাঙ্ক্ষিত বাগানের গাছগুলোর পরিচর্যা করা সহজ হয়।

৪। উভয় সম্পদ থেকে (বাগানের ফসল ও ছাগল) আয় হওয়ায় বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বেঁধে ছাগল পালন করা

যেসব এলাকায় জমি উর্বর এবং অর্থকরী ফসল ভাল হয় সেসব এলাকায় এক শস্য থেকে অন্য শস্য বপনের মাঝখানে যে বিরতি থাকে এবং জমিগুলোতে তখন আগাছা জন্মায়, তখন বেঁধে ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। কারণ তাতে অন্যের জমির ফসল নষ্ট করতে পারে না। দুটি পদ্ধতিতে ছাগল বেঁধে পালন করা যেতে

পারে। এক নির্দিষ্ট একটি স্থানে খুঁটি পুঁতে তাতে বেঁধে পালন করা যায় যাতে রশির দূরত্বের সমান চক্রাকারে ঘুরে খেতে পারে (চিত্র ৩৪)।

চিত্র ৩৪ ঃ খুঁটিতে বেঁধে ছাগল চড়ানোর পদ্ধতি

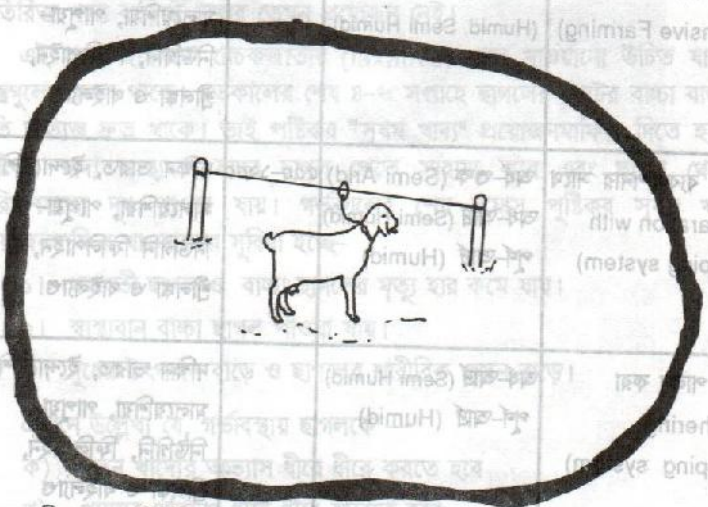

চিত্র ৩৫ ঃ দুটি খুঁটিতে তার বেঁধে এর সাথে রিং দিয়ে ছাগল বেঁধে চড়ানোর পদ্ধতি

দুটি খুঁটির মধ্যে তার বেঁধে তাতে কড়াই (ring) এর সাহায্যে ছাগল বেঁধে পালন করা যায়। এই ব্যবস্থায় রাতে ছাগল বাড়িতে এনে পানি পান করাতে হয়।

সারণি ৮ ঃ দুটি খুঁটিতে তার বেঁধে এর সাথে রিং দিয়ে ছাগল বেঁধে চড়ানোর পদ্ধতি জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ছাগল পালন ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাস

পালন ব্যবস্থা (Farming Systems)	জলবায়ু (Climates)	বছরে বৃষ্টি পাতের পরিমাণ (মিমি)	সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ
নিচু জমিতে ছোট খামার (Extensive Farming)	অর্ধ শুষ্ক (Semi Arid)	৫০০–১২০০	উত্তর ভারত, ইরান আফগানিস্থান অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ
উঁচু জমিতে ছোট খামার (Extensive Farming)	শুষ্ক (Arid)	৫০০	নেপাল ও আফগানিস্থান
বড় খামার (Intensive Farming)	আর্দ্রতাপূর্ণ (Humid, Semi Humid)	১২০০	দক্ষিন ভারত, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া, পাপুয়া–নিউগিনি, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ড
বাগান ব্যবস্থাপনার সাথে (Intearation with cropping system)	অর্ধ–শুষ্ক (Semi Arid) অর্ধ–আর্দ্র (Semi-Humid) পূর্ণ–আর্দ্র (Humid)	৫০০–১২০০	দক্ষিন ভারত, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া, পাপুয়া–নিউগিনি ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ড
বেঁধে পালন করা (Tethering cropping system)	অর্ধ–আর্দ্র (Semi Humid) পূর্ণ–আর্দ্র (Humid)		দক্ষিন ভারত, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া, পাপুয়া–নিউগিনি, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ড

প্রজননের জন্য ব্যবহৃত স্ত্রী ছাগলের ব্যবস্থাপনা

প্রজননের জন্য ব্যবহৃত স্ত্রী ছাগল শরীরের অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনটি ধাপে জীবন ধারণ করে থাকে—

(ক) দুগ্ধদান বিরতিকাল (Weaning to mating)
(খ) গর্ভকালীন কাল (Mating to kidding)
(গ) দুগ্ধদানকালীন কাল (Kidding to weaning)

(ক) দুগ্ধদান বিরতি কাল

এই সময়ে স্ত্রী ছাগল দুধ না দিলে যত্ন নেয়া উচিত কারণ বিগত গর্ভকাল ও দুগ্ধদানকালে শরীরের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেয়া এবং আগামীতে গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানের জন্য শরীরকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হয়। শরীরের অনালী তন্ত্র (endocrine system) পরবর্তী গর্ভধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তৈরি করে তোলে এবং এর জন্য দরকার পুষ্টিকর খাদ্যের। এই সময়ে ও প্রতি ৪০টি স্ত্রী ছাগলের জন্য একটি সুস্থ সবল পাঠা (পুরুষ ছাগল) রাখতে হবে।

(খ) গর্ভকাল

গর্ভকালের প্রথম তিন মাস ভ্রূণের (foetus) বাড়ার গতি অত্যন্ত মন্থর সুতরাং অতিরিক্ত খাদ্য বাড়িয়ে দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই।

এই সময় ছাগলকে রেচকজাতীয় (laxative) খাদ্য খাওয়ানো উচিত যাতে অন্ত্রগুলো স্বচ্ছল থাকে। গর্ভকালের শেষ ৪-৬ সপ্তাহে ছাগলের পেটের বাচ্চা বাড়ার গতি অত্যন্ত দ্রুত থাকে। তাই পুষ্টিকর "সুষম খাদ্য" প্রয়োজনমাফিক দিতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যবান বাচ্চা ছাগল পেতে সাহায্য করে এবং ছাগল থেকে পরিমাণমতো দুধ পাওয়া যায়। গর্ভকালের শেষ দু'মাস পুষ্টিকর সুষম খাদ্য প্রয়োজনমাফিক খাওয়ানোর সুবিধা হচ্ছে-

১। গর্ভবতী ছাগল ও বাচ্চা ছাগলের মৃত্যু হার কমে যায়।
২। স্বাস্থ্যবান বাচ্চা ছাগল পাওয়া যায়।
৩। দুধের উৎপাদন বাড়ে ও ছাগলের শারীরিক ওজন বাড়ে।

এখানে উল্লেখ্য যে, গর্ভাবস্থায় ছাগলকে —

ক) নতুন খাদ্যের অভ্যাস ধীরে ধীরে করতে হবে
খ) খাদ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে
গ) হঠাৎ করে খাদ্যের পরিবর্তন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

ঘ) পানি ও রক সল্ট সবসময় নাগালের মধ্যে রাখতে হবে

ঙ) গর্ভকালের শেষ ভাগে প্রতিটি গর্ভবতী ছাগলকে আলাদা করে রাখতে হবে যেখানে সে ছাগলটি বাচ্চা প্রসব করবে। এই সময় মেঝেতে বস্তা (gunny) বিছিয়ে রাখা আরামদায়ক ও নিরাপদ।

ছাগল বাচ্চা প্রসবকালীন লক্ষণসমূহ —

১। ছাগল অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে, বারবার ডাকা ও প্রস্রাব করা।

চিত্র ৩৬ ঃ সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু বাচ্চা ছাগলকে এর মা জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিস্কার করছে

২। উঠা-বসা করতে থাকবে।

৩। মেঝের ঘ্রাণ (smelling) নিতে থাকে।

এই অবস্থা দেখা গেলে অনুমান করতে হবে যে ছাগলটি ২/১ ঘন্টার মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করবে।

৪। পানির থলে (water bag) যোনিপথে দেখা দিবে।

৫। পানির থলে ফেটে গেলে শিশু বাচ্চা ছাগলের (Baby Kid) পা দেখা যাবে।

যদি শিশু ছাগলের একটি পা ভিতরে থাকে,

যদি শিশু ছাগলের দুটি পা ভিতরে থাকে,

যদি শিশু ছাগলটি উল্টো দিকে থাকে,

যদি শিশু ছাগলটি অবস্থান ঠিকমতো না থাকে, তবে —

এইসব অবস্থায় অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। চিত্র ৩৬-এ সদ্য ভূমিষ্ট শিশু বাচ্চা ছাগলটিকে তার মা জিহ্বা দিয়ে (চেটে) পরিষ্কার করছে।

দুগ্ধদানকাল

দুগ্ধদানকারী ছাগলের যত্ন এমনভাবে নিতে হবে যাতে সে তার নিজের শরীরের চাহিদা, বাচ্চা ছাগলের চাহিদা ও তার মালিকের চাহিদা মেটাতে পারে। গর্ভকালের চেয়ে দুগ্ধদানকালে পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা বেশি থাকে। "মুখে দুধ" প্রবাদ বাক্যের সাহায্যে এটাই বোঝা যায় যে, সুষম খাদ্য খাওয়ালে দুধের উৎপাদন বাড়তে বাধ্য।

বাচ্চা ছাগলের (Baby Kids Management) **ব্যবস্থাপনা**

(ক) বাচ্চা ছাগল ভূমিষ্ট হওয়ার পর জিহ্বায় সুড়সুড়ি বা নাড়াচাড়া দিলে কাশি দিতে চাইবে যা শ্বাসতন্ত্রকে কার্যকরী করতে সাহায্য করে (by a relex action)

(খ) মায়ের সামনে বাচ্চা ছাগল রাখতে হবে যাতে মা (স্ত্রী ছাগলটি) তাকে চাটতে পারে।

(গ) ছাগলটি উলানের বাঁট (teats of the udder) পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কারণ যদি দুধের পরিমাণ কম হবে বলে ধারণা করা হয় তাহলে বাচ্চা ছাগলের জন্য বাঁটের দুধ খাওয়াতে হবে। তবে উলানের প্রথম দুধ অবশ্যই সব কটি বাচ্চা ছাগলকে খাওয়াতে হবে।

বাচ্চা ছাগল জীবনের প্রথম সপ্তাহে রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাই সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। মা-ছাগলকে ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া না থাকলে উভয়কেই ধনুষ্টংকার রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। জন্মের পর বাচ্চা ছাগলকে ছাগলের উলানের প্রথম দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে কারণ এই দুধ (colostrum) পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্রম চালু করতে সাহায্য (stimulate) করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ করে। যেসব ছাগল দুধ উৎপাদনের জন্য (dairy goats) পালন করা হয়ে থাকে সেসব ছাগলের বাচ্চা ছাগলকে ইচ্ছা মাফিক বোতল দিয়ে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে বোতল ও বোতলের বাঁট (nipple) অবশ্যই রোগ-জীবাণুমুক্ত হতে হবে। দুধ কুসুম গরম (৩৬° সেঃ) খাওয়াতে হবে।

প্রতিটি বাচ্চা ছাগলকে দৈনিক ০.৯-১.০ লিটার দুধ তিন-চার বারে খাওয়াতে হবে। দুধের বিকল্প খাদ্য তিন সপ্তাহ বয়সের পর খেতে দেয়া যেতে পারে। তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চা ছাগলকে দিনে দু'বেলা দুধ বা দুধের বিকল্প খাদ্য খাওয়াতে হবে।

মা ছাগল থেকে বাচ্চা ছাগলকে আলাদা করার সময়

মা ছাগল থেকে বাচ্চা ছাগলকে আলাদা করা নির্ভর করছে কি উদ্দেশ্য ছাগলটি পালন করা হবে। মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হলে বাচ্চা ছাগলটিকে বেশিদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ দেরিতে আলাদা করতে হবে। গ্রীষ্মমণ্ডলে বাচ্চা ছাগল তিন মাস বয়সের পূর্বে মা থেকে আলাদা করা ঠিক নয়।

দুধের জন্য ব্যবহৃত ছাগল থেকে তিন দিন কলোস্ট্রাম (colostrum) দুধ খাওয়ানোর পর বাচ্চা ছাগল আলাদা করে নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে বোতল দিয়ে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করিয়ে নিতে হবে। যেসব ছাগল বেশি দুধ দেয় সেসব ছাগলের বাচ্চার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা লাভজনক। এতে ছাগলের অতিরিক্ত দুধ বিক্রি করা সম্ভব। মা থেকে বাচ্চা আলাদা করার সময়ে দুধ থেকে শক্ত খাবারের অভ্যাস ধীরে ধীরে করিয়ে নিতে হবে। দু-তিন সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা ছাগলকে কচি ঘাস, কচি পাতা ও কিছু কিছু শুষ্ক দানাদার খাদ্য খেতে আরম্ভ করে ; এর ফলে পাকস্থলী (rumen) কার্যকরী হতে থাকে।

জাপানে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, জন্মের সময় বাচ্চা ছাগলের পাকস্থলীর ৮০ ভাগ এবোমেসাম (Abomasum) থাকে, যা ২.৫ মাস বয়সে ২০ ভাগে নেমে আসে এবং এই বয়স থেকে বাচ্চা ছাগল শক্ত খাদ্য হজম করতে আরম্ভ করে।

প্রজননের জন্য ব্যবহৃত পাঠা ছাগল (Buck) পালন ব্যবস্থাপনা (Management of Breeding Buck)

পুরুষ ছাগল স্ত্রী ছাগল থেকে কম বয়সে যৌনতা প্রাপ্ত হয়, তাই পুরুষ ছাগল আলাদাভাবে পালন করা হয়ে থাকে। পাঠা ছাগলের শরীরে ক্যাপরিক (capric) এবং ক্যাপ্রোয়িক (caproic) এসিড থাকে যা পাঠার পশমের সাথে দুধে মিশে বিশ্রি গন্ধের সৃষ্টি করে যা মানুষের অপছন্দনীয়। পাঠাকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনমাফিক সুষম খাবার দিতে হবে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত পাঠা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। এদেরকে প্রয়োজনে ক্রিমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। যেসব পুরুষ ছাগল প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না তাদেরকে খাসি করাতে হবে।

ছাগলের বাসস্থান (Housing for Goats)

প্রাণী মাত্রেরই বাসস্থানের প্রয়োজন। গৃহপালিত ছাগলের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালনে ছাগলের বাসস্থানের তেমন কোন ভিন্ন বন্দোবস্ত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না। গোয়াল ঘরে গবাদি পশুর পাশাপাশি, বারান্দায়, রান্নাঘরে, কেউ বা নিজেদের বসবাসের ঘরের মধ্যে কিংবা মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় গাছের নিচেই রাতে ছাগল রাখেন। দু'চারটি ছাগল পালনে এই ধরনের ব্যবস্থা চলতে পারে। কিন্তু এক সাথে অনেক ছাগল পালন করলে কিংবা ছাগলের খামার করলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় ছাগলের থাকার ঘর তৈরি করতে হবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলে ছাগলের ঘর তৈরির সময় এলাকার —

(ক) তাপমাত্রা (temperature)

(খ) আর্দ্রতা (Humidity)

(গ) বৃষ্টিপাত (Rainfall) এবং কি কাজে ছাগল পালন করা হচ্ছে, যেমন —

১) দুধ উৎপাদনের জন্য (Milk production)

২) মাংস উৎপাদনের জন্য (Meat production), এসব তথ্য জানা থাকতে হবে।

বাংলাদেশে ঘর তৈরির সময় বৃষ্টির পানির ছিটে যাতে ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য চালার বেশ কিছু অংশ ঘর থেকে বাইরের দিকে নামানো থাকা দরকার। ঘরের দেয়ালের অর্ধেকটা বাঁশের বেড়া কিংবা ইট দিয়ে বাকি অর্ধেকটা ত্রিপল বা চট দিয়ে ঢাকা থাকলে শীতের রাতে কিংবা বৃষ্টির সময় ঠাণ্ডা লাগা থেকে ছাগল রক্ষা পায়।

ছাগলের ঘর কোনক্রমেই স্যাঁতসেঁতে রাখা উচিত নয়। এতে পরজীবী বা রোগ-জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শীতের হাওয়া ও ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ছাগলের ঘর সেভাবে তৈরি করতে হবে।

শুষ্ক গরম পরিবেশে (In hot, arid environments) দিনের বেলায় ছাগল ঘরের ভিতর রাখতে হয়। বাংলাদেশে প্রচণ্ড রোদে ছাগল চড়ানো ঠিক নয়। এই সময় ছাগল ঠাণ্ডা স্থানে গাছের নিচে অথবা ঘরে রাখা উচিত। গরম থেকে রক্ষা করার জন্য ছাগলের ঘরে প্রয়োজনীয় পাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডল (Humid Tropics)

আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলে বৃষ্টি-বাদলে ছাগলকে ঘরের ভিতর রাখতে হয়। কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভিজলে ছাগল নিউমোনিয়া ও ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। ছাগলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ছাড়া খামারে ছাগল পালন করে লাভবান হওয়া যায় না। কারণ অতিরিক্ত গরমে শরীরের বিভিন্ন অনালী গ্রন্থিগুলো শরীরের তাপমাত্রার সাথে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় (Increased function) এবং শরীরের পানির সাথে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামজাতীয় খনিজ বের হয়ে যায়। দেশীয় ছাগল অনেকটা গরম সহ্য করতে পারে, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের ছাগল যেমন স্যানিন (Saanen) জাতের ছাগল গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না।

তাই এই জাতীয় ছাগলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের দরকার। ছাগলের ঘর তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘরটির মধ্যে প্রচুর আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে, তাপ, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং সহজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখা যায়। মাটির দেয়ালে আবদ্ধ ঘর ছাগল পালনের জন্য উপযুক্ত নয়। ছাগলের ঘরের আশে-পাশে যাতে পানি জমে না থাকে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ছাগলের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন ধরনের ঘরে ছাগল পালন করা যায়। ছাগলের ঘরের কয়েকটি নমুনা নিচে দেয়া হলো —

(ক) ভূমি সমতল ঘর (Ground Level Housing)

(খ) খুঁটির উপর ঘর (Huses on Pillar)

উভয় ধরনের ঘরই এক চালা হতে পারে, দু' চালা হতে পারে। চার চালা হতে পারে।

ভূমি সমতল ঘর (Ground Level Housing)

এই জাতীয় ঘর ভূমির উপর ভিটি তৈরি করে করা হয় —

১। ঘরের ভিটি কাঁচা (মাটির) হতে পারে।

২। ঘরের ভিটি পাকা (ইট) হতে পারে।

৩। ঘরের ভিটি আধা-পাকা (শুধু ইট) হতে পারে।

চিত্র ৩৭ ঃ ভূমি সমতল একটি দেশী ঘরের নমুনা দেখানো হলো

এই জাতীয় ঘরে দেশীয় ঘর তৈরির সামগ্রী ব্যবহার করা চলে, যেমন– বাঁশ, শন, খড়, তালগাছের পাতা, গোলপাতা, ঢেউ টিন এমনকি টালি পর্যন্ত।

পিলার বা খুঁটির উপর ঘর

পিলার বা খুঁটির উপর ছাগল পালনের জন্য যে ঘর তৈরি করা হয়, সাধারণত সে ঘরের মেঝে ভূমি থেকে ১ থেকে ১.৫ মিটার উঁচুতে তৈরি করা উচিত। খুঁটি বা পিলার এই মেঝের ভার বহন করে। এই জাতীয় ঘর ছাগলকে মাটির স্যাঁতসেতে ভাব, বন্যার পানি, নালা–নর্দমা থেকে চোয়ানো পানি থেকে রক্ষা করে এবং কৃমিজাতীয় প্রাণী থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। এই জাতীয় ঘরের মেঝে বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে তৈরি হতে পারে। তবে বাঁশ, কাঠ, স্টিল ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র ৩৮–এ একটি ঘর দেখানো হলো, যা কাঠের পিলার বা খুঁটি কাঠের বেড়া ও চালে শন ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। ছোট খামারের জন্য এই জাতীয় ঘর উপযুক্ত।

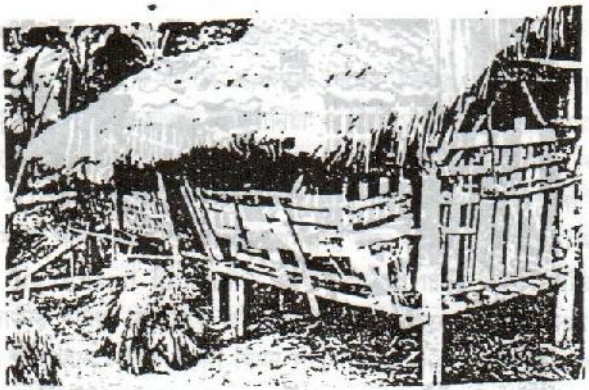

চিত্র ৩৮ ঃ পিলারের উপর স্থাপিত আধুনিক ডিজাইনের একটি ঘর

ছাগল পালনের জন্য উপরে দুটি আধুনিক খামার পিলারের উপর স্থাপিত ঘরের নমুনা দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৩৯ ঃ পিলারের উপর স্থাপিত আধুনিক ডিজাইনের একটি ঘর

পিলার বা খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘর পরিস্কার করা ও রাখা সহজ, ছাগলের গোবর ও চনা সংগ্রহ করা সহজ। মেঝের ফাঁক দিয়ে চনা ও গোবর ঘরের নিচে পড়ে যায় বলে খাদ্য ও পানি এসব দিয়ে দূষিত (contaminated) হয় না ফলে খাদ্য ও পানির অপচয় হয় না। একটি ১.৮ মিঃ × ১.৯৮ মি. × ১— ৩মি. আকারের ঘরে ১০ টি বাচ্চা

চিত্র ৪০ ঃ পিলারের উপর স্থাপিত আধুনিক ডিজাইনের একটি ঘর

ছাগল রাখা যায়। খামারে আকৃতি কিংবা চাহিদা মোতাবেক ঘর ছোট-বড় করা যায়। ছাগলের ঘরে মাথাপিছু জায়গার চাহিদার পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৮ ঃ ছাগলের প্রকৃতি ও বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ।

ছাগলের প্রকৃতি (Type)	বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)
বাচ্চা ছাগল (Kids)	০.৩
অগর্ভকাল সময় (Non pregnent)	১.৫
গর্ভকাল সময় (Pregnant)	১.৯
পাঠার জন্য (Male for Breeding)	২.৮

* এক মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার = ৩.২৮ ফুট

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্থাপিত খামারে বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জন্য মাথাপিছু জায়গার পরিমাণ – ০.৭৫ × ৪.৫ × ৪.৮ মিটার।

একটি পাঠা রাখার জন্য স্টলের (stall) পরিমাপ ২.৪ × ১.৮ মিটার।

একটি বড় জাতের ছাগলের জন্য কিছু বেশি জায়গার প্রয়োজন হতে পারে।

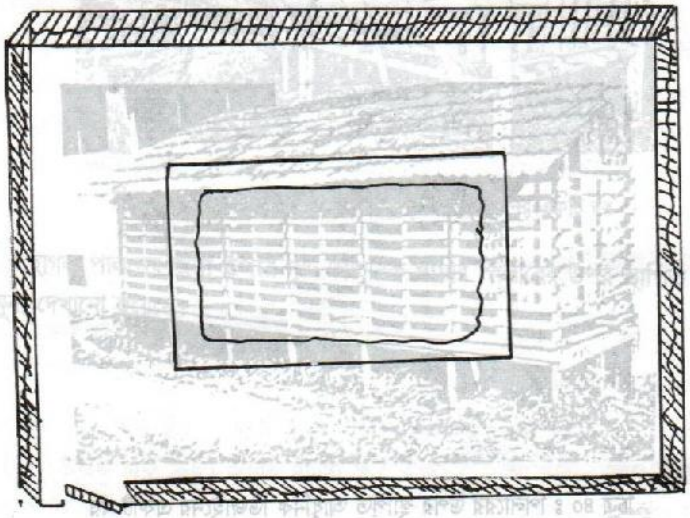

চিত্র ৪১ ঃ খোয়ার (corrals) জাতীয় একটি খামারের নকশা

১০০–১২৫টি মাঝারি ছাগলের জন্য ঘেরাও করা জায়গার পরিমাণ ১২ × ১৮ মিটার (৩৯ × ৫৯ ফুট), নিচে খোয়াজাতীয় (corrals) একটি খামারের নকশা দেখানো হলো।

ছোট খামারের জন্য (Extensive farming) খামারজাতীয় ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান খুবই উপযুক্ত।

এক চালা ঘর ঃ এই জাতীয় ঘরের সম্মুখ ভাগ ২–৩ মিটার উঁচু এবং ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে পেছনের দিকের উচ্চতা ১–১.৫ মিটার। এই জাতীয় ঘর ছোট খামার মালিকদের জন্য খুবই উপযুক্ত। সুবিধাজনক হলে বড় ঘরের দেয়াল ঘেঁষে এই জাতীয় ঘর তৈরি করা যায়। এতে ছাগল চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং বন্য পশু ছাগলের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

দোচালা ঘর বা দালান (House/Building with sloping eaves)

এই জাতীয় ছাগল থাকার ঘর পাকা হতে পারে, আধা-পাকা হতে পারে। টিনের বা এসবেস্টসের চাল বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হতে পারে। ঘর তৈরির দ্রব্য-সামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতা, দামে সস্তা, টেকসই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যেকোন ঘর তৈরির সামগ্রী দিয়ে এই জাতীয় ঘর তৈরি করা যায়। ঘরের আকার ছাগলের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেইসব এলাকায় ঘরের চালাগুলো এমনভাবে নিচে নামিয়ে (sloping eaves) দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকতে না পারে।

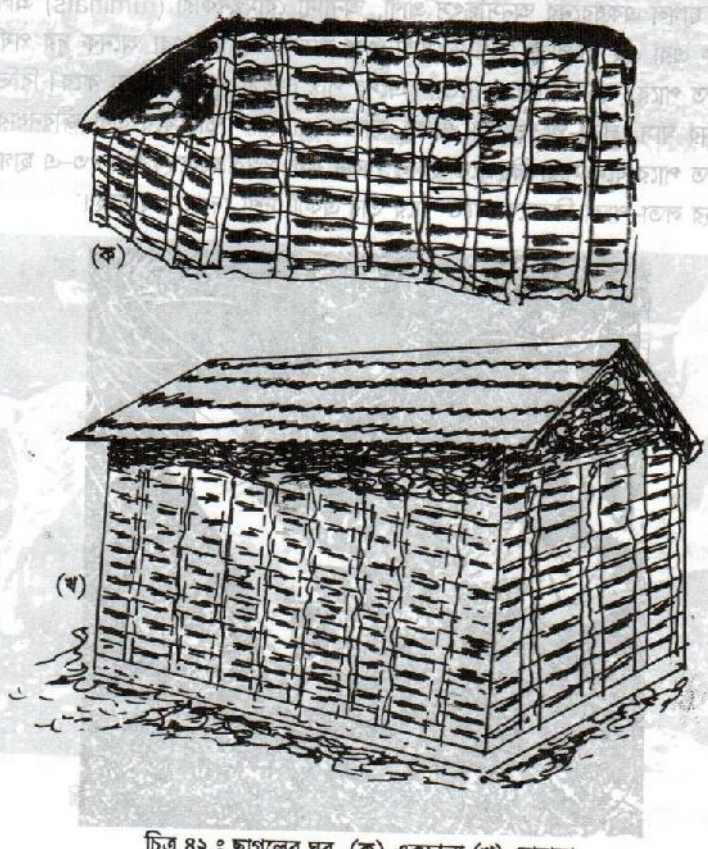

চিত্র ৪২ ঃ ছাগলের ঘর (ক) একচালা (খ) দোচালা

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য-পুষ্টি ও পুষ্টি অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস (Feeding habits) **ও আচরণ** (Behaviour)

ছাগল একধরনের অনুসন্ধিৎসু প্রাণী, অন্যান্য রোমন্থনকারী (ruminats) প্রাণী থেকে এরা এই ব্যাপারে বেশি উৎসাহী এবং খাদ্যের সন্ধানে এরা অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে পারে। এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের ঘাস, লতা-পাতা, তৃণ ও বহু জাতের গাছের পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করতে পারে বলে সারা বিশ্বজুড়ে ছাগল পালন করা সম্ভব হয়েছে। চিত্র ৪৩-এ ছাগল গাছের লতা-পাতা কিভাবে খেতে পারে তার একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৪৩ ঃ ছাগলের লতা-পাতা খাওয়ার দৃশ্য

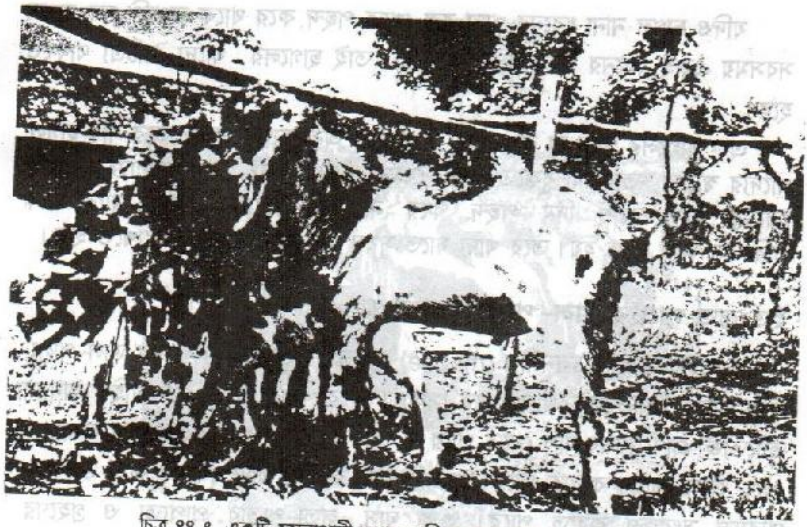

চিত্র ৪৪ ঃ একটি যমুনাপারী ছাগল ঝুলিয়ে রাখা গাছের পাতা খাচ্ছে

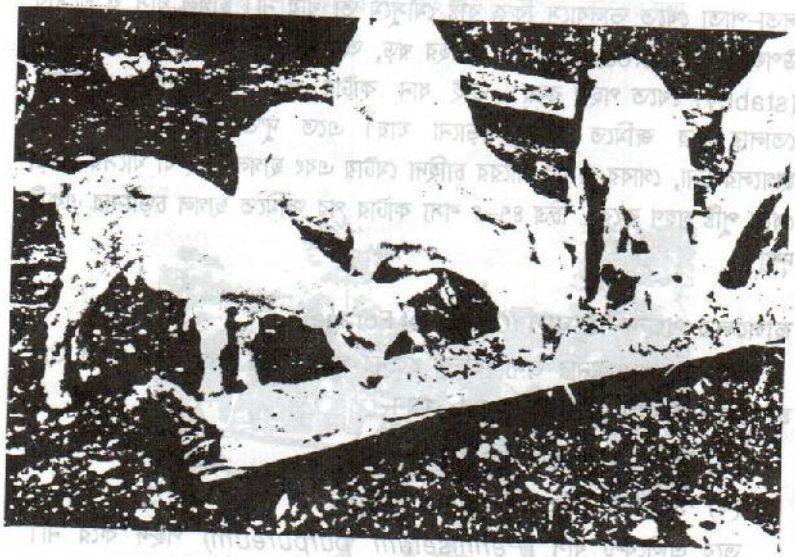

চিত্র ৪৫ ঃ ছাগলকে দানার খাদ্য খাওয়ানোর একটি দৃশ্য দেখানো হচ্ছে

যদিও ছাগল নানা ধরনের খাদ্য বস্তু খেতে পছন্দ করে থাকে তথাপি সব ছাগল সবসময় একই ধরনের খাদ্য পছন্দ করে না। তাই ছাগলের খাদ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে।

এক ছাগলের গ্রহণ না করা খাদ্য সাধারণত অন্য ছাগল পছন্দ করে না। ছাগল খাদ্যের স্বাদের তারতম্য বুঝতে পারে, যেমন– তিতা, মিষ্টি, টক, লবণাক্ত। একই ধরনের খাদ্য বেশি দিন পছন্দ করে না, তাই খাদ্যের উপাদান মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে দিতে হয়। তবে খাদ্য যাতে সুষম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ইত:স্তত গাছের ডাল–পালা খাওয়া (Browse)

ছাগলের উপরের চলনশীল (mobile) ঝুলন্তপ্রায় ঠোঁট (lip) গাছের ডাল-পালা, লতা-পাতা, ছোট ছোট খাস খেতে সাহায্য করে। যার ফলে গরু মহিষ অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণী যেসব ঘাস খেতে পারে না, ছাগল সেসব ঘাস, লতা-পাতা অনায়াসে খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। এমনকি এই জাতীয় খাদ্য খেয়েও এরা উৎপাদন পরিমাণ সংরক্ষণ করতে পারে। শুষ্ক ঘাস, লতা-পাতার প্রাপ্যতা ও গ্রহণের অগ্রাহ্যতা বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে ছাগল ঝোপ-জঙ্গলের লতা-পাতা খেতে ভালবাসে কিন্তু বৃষ্টি মৌসুমে তা খায় না। ছাগল ঘাস ও শস্যের উপজাত (By products) ডাল গাছের খড়, অন্যান্য শস্য গাছ বা ঘাসের গোড়া (stabby) খেতে পছন্দ করে। তাই ধান কাটার পর কিংবা কোন রবিশস্য তোলার পর জমিতে ছাগল চড়ানো যায়। এতে দু'ভাবে উপকার হয়– এক, ছাগলের চনা, গোবর জমির সারের চাহিদা মেটায় এবং ছাগল গাছ বা ঘাসের গোড়া খেয়ে পুষ্টি গ্রহণ করে। চিত্র ৪৭–এ শস্য কাটার পর জমিতে ছাগল চড়ানোর একটি দৃশ্য।

ছাগলের পছন্দনীয় ঘাস (Choice of Forage)

ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘাসের চাষ করা যেতে পারে তবে ছাগল গরু আঁশযুক্ত ঘাস পছন্দ করে, যেমন–

(ক) গিনি ঘাস *(Panicum maximum)*

(খ) প্যাংগোলা *(Digitaria decumbens)*

তবে এলিফেন্ট ঘাস *(Pennisetum purpureum)* পছন্দ করে না। ঘাসপ্রাপ্তির উপরও পছন্দ অপছন্দ নির্ভর করে। ঘাস প্রাপ্তি নির্ভর করে –

চিত্র ৪৬ ঃ শস্য কাটার পর সেই জমিতে ছাগল চড়ানোর দৃশ্য

চিত্র ৪৭ ঃ নাইজেরিয়ার রেড মুকুট জাতের ছাগল মাঠে চড়ানোর একটি দৃশ্য

১। এলাকার মাটির গুণাগুণের উপর।
২। এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর।
৩। ঘাসের চারা বা বীজ প্রাপ্তির উপর।
৪। এলাকার আবহাওয়ার উপর।

সারণি ৯ ঃ ছাগলের খাদ্যের জন্য উপযুক্ত কয়েকটি ঘাসের সাধারণ নাম বৈজ্ঞানিক নাম এবং যে পরিবেশে জন্মায়– এইসব তথ্য।

পরিবেশ	সাধারণ নাম (Common Name)	প্রজাতির নাম (Species)
আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডল (Humid Tropics)	আফ্রিকার স্টার অথবা জায়েন্ট স্টার	*Cynodon plectostachyus*
	বারমুডা (Bermuda)	*Cynodor dactylon*
	সেটারিয়া (setaria	*Setaria spendida*
	এলিফেন্ট বা নেপিয়ার (Elephant or Napier)	*Pennisetum purpureum*
	গিনি (Guinea)	*Peniceum maximum*
	প্যাংগোলা (Pangola)	*Digitaria decumbens*
	প্যারা (Para)	*Bruchiaria matica*
	সিগনাল (Signal)	*Brachiaria brizantha*
শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডল (Dry Tropics)	বাফেল (Buffel)	*Cenchurus ciliaris*
	কলম্বাস (Columbus)	*Chloris gayana*
	মাকারিকারি (Makarikari)	*Panicum cloratum*
পাহাড়ী এলাকা (Mantane) (Tropics)	বাইয়া (Bahia)	*Paspulum nototum*
	ডালিস (Dalis)	*Paspulum dilatatum*
	কিকুই (Kikuyu)	*Pennisetum clan destinium*
	নন্দীসেটারিয়া (Nondi setaria)	*Setaria sphacelata*

ছাগলকে গাছের পাতা খাওয়ানো আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি প্রচলিত প্রথা। আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলে বিভিন্ন জাতের গাছের পাতা প্রচুর পাওয়া যায় যা ছাগলের পুষ্টি যোগানে সাহায্য করে। নিচের সারণিতে যে সব গাছের পাতা ছাগলকে খাওয়ানো যায় সেগুলো সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লিপিবদ্ধ করা হলো —

সারণি ১০ ঃ বিভিন্ন ছাগলকে খাওয়ানোর উপযোগী গাছের নাম

অঞ্চলের নাম	সাধারণ নাম	প্রজাতির নাম
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-	বাঁধাকপি	*Brassica*
	কলাগাছেরপাতা Banana	*Musa* sp.
	ক্যাসাভা (Cassava)	*Manihot esculenta*
	বারগাড (Bargad)	*Fiscus bengalensis*
	বারি (Bari)	*Ziziyphus tujuba*
	গ্লিরিসিডা (Gliricida)	*Gliricida sepium*
	গুলার (Gular)	*Ficus glomerata*
	হিবিস্কাস (Hibiscus)	*Hibiscus rosa sinesis*
	ইপিল ইপিল (Ipil Ipil)	*Leucaena leucocephala*
	কাঁঠাল গাছের পাতা (Jack fruit)	*Artocarpus integrifolia*
	খানথাল (Khanthal)	*Artocarpus* spp.
	কালোজাম (Malberry)	*Morus indica*
	নিম (Neam)	*Azadirechta indica*
	পিজিয়ন পি (Pigeon Pea)	*Cajanus cajan*

আরও অনেক নামজানা বা অজানা গাছের পাতা ছাগলকে খাওয়ানো হয়। গাছের এসব পাতা সংগ্রহ করার জন্য ছাগলের মালিক ২/১ কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হয়। বাংলাদেশে আখের গাছের পাতা ও আগা, আনারস গাছের পাতা ও খোসা, বাঁশ গাছের পাতা ছাগলকে প্রচুর খাওয়ানো হয়ে থাকে। এসব গাছের পাতা নিয়ে গবেষণা করে এদের পুষ্টিমান ও ক্ষতিকারক কোন দিক আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। ইপিল ইপল (Ipil ipil) ও হিবিস্কাস গাছের পাতা বেশি পরিমাণে

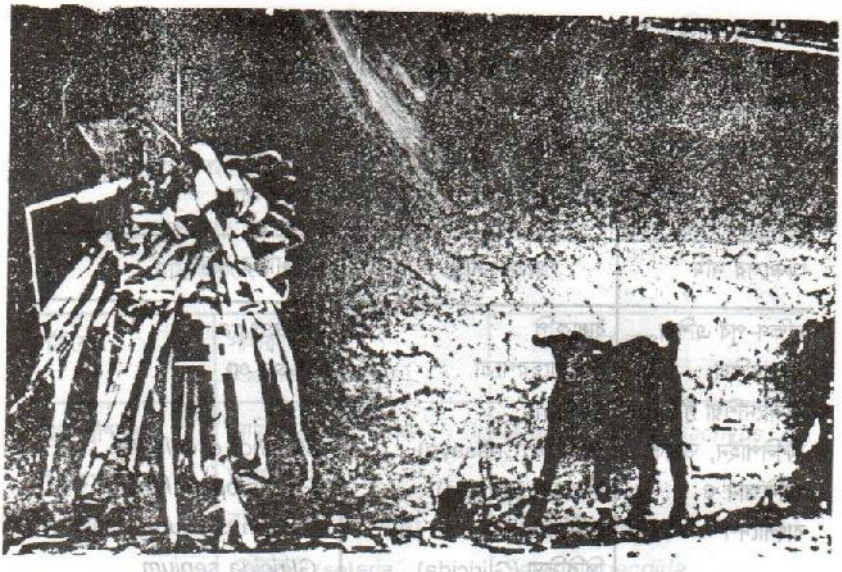

চিত্র ৪৮ ঃ বেঁধেরাখা একটি ছাগলকে কলাগাছের পাতা খাওয়ানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে

চিত্র ৪৯ ঃ একজন ছাগলের খামার মালিক ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা সংগ্রহ করে বহন করে চলছে খামারের উদ্দেশ্য

খাওয়ালে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। বাঁধাকপি *(Brassica)* ও বিভিন্ন ধরনের সরিষার শাক এই গ্লুকোসাইনোলেটস (Glucosinolates) ও থায়োসায়ানেট থাকে। গ্লুকোসাইনোলেটস থায়োক্সিল সংশ্লেষণে বাঁধা দেয় এবং থায়োসায়ানেট (Thiocyanate) থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, ফলে আইয়োডিনের অভাব ঘটায় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

পাকিস্তানে ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য গাছের পাতা কুটি কুচি করে কেটে (chopped) খাটিয়ার উপর দিয়ে সেগুলো শুকানো হচ্ছে। চিত্র ৫০-এ এই ধরনের দৃশ্যই দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৫০ ঃ গাছের পাতা কুটি কুচি করে কেটে খাটিয়ার ওপর শুকানোর দৃশ্য

এইসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সময় এসেছে, কারণ চারণ ভূমি দিন দিন কমছে, তাই জিরো গ্রেজিং (Zero grazing) এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

খনিজ

সারণি ১১ঃ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাবে ছাগলের মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এসব খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস

খনিজ পদার্থের নাম	যে বয়সের ছাগল আক্রান্ত হতে পারে	অভাবের কারণে পরিলক্ষিত লক্ষণ	খনিজ পদার্থের উৎস
১. ক্যালসিয়াম (Calcium)	অল্প বয়স্ক বা বয়স্ক দুগ্ধবতী ছাগল	রিকেট, অস্টিওম্যালা-সিয়া, বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, মিল্ক ফিভার।	দুধ, সবুজ ঘাস শুটকি, হাড়, চুনাপাথর, মাংস অন্যান্য ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ
২. ক্লোরিন (Chlorine)	সব বয়সের ছাগল	খাদ্যে অরুচি ও বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।	শুটকি, মাংস, হাড় ও লবণে
৩. ফসফরাস (Phosphorus)	সব বয়সের ছাগল	রিকেট অস্ট্রিওমেলাসিয়া কম দুধ দেয়া, খাদ্যে অরুচি, গিরা (joints) শক্ত হয়ে যাওয়া, জন্ম দানে অক্ষম (Infertile)	
৪.পটাশিয়াম (Potassium)	বাচ্চা বা অল্প বয়স্ক ছাগল	প্যারালাইসিস	সবুজ ঘাস
৫. ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	বাচ্চা ছাগল সাধারণত ২০–২৫ দিন বয়স্ক ছাগল	গ্রাস টেটানি (Grass Tetany)	গমের ভূষি, কটন সীড ও তিসির খৈল ঘাসের জমিতে এই খনিজটি দিতে হবে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে ইনজেকশন দিতে হবে।
৬. সোডিয়াম (Sodium)	সব বয়সের ছাগল	খাদ্যে অরুচি, বৃদ্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত, প্রস্রাব কম হওয়া ইত্যাদি	শুটকি, মাংস, হাড় ও খাবার লবণ।

খনিজ পদার্থের নাম	যে বয়সের ছাগল আক্রান্ত হতে পারে	অভাবের কারণে পরিলক্ষিত লক্ষণ	খনিজ পদার্থের উৎস
৭. সালফার (Sulphaur)	সব বয়সের ছাগল	এমাইনো এসিড তৈরি কমে যায় যেমন সিস্টেইন, সিস্টাইন ও মিথিওনিন, স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আমিষজাতীয়, খাদ্যে ও সোডিয়াম সালফেট-এ
৮. কোবাল্ট (Cobalt)	সব বয়সের ছাগল	স্বাস্থ্যহানি ও অস্থিরতা দেখা দেয়।	কোবাল্ট ও ভিটামিন
৯. তুঁতে (Copper)	সব বয়সের ছাগল	রক্তস্বল্পতা, হালকা বাড়ন, হাড়ের অস্বাভাবিকতা, পশম ও লোমের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। অন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেয় এবং পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে	সাহেব/ঘাসের বীজ/দানা কপার-এ পাওয়া যায়।
১০. ফ্লোরিন (Fluorine)	সব বয়সের ছাগল	দাঁতের ক্ষয় প্রাপ্তি (Dental caries)	অল্প পরিমাণ Fluoride দিয়ে চিকিৎসা করা যায়
১১. আয়োডিন (Iodine)	সব বয়সের ছাগল	গয়টার (goiter), বড়গলা (Big Neck), বাচ্চা জন্ম দিতে অপারগতা (Reproductive failure)	সামুদ্রিক মাছের শুটকি ও আয়োডিনযুক্ত লবণ
১২. লোহা (Iron)	বাচ্চা ছাগলের	রক্তাল্পতা (Anaemia)	সবুজ পাতাজাতীয় ঘাসে ও লৌহজাত ওষুধ।
১৩. ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	সব বয়সের ছাগল	হালকা গড়ন, পায়ের অস্বাভাবিকতা, বাচ্চা জন্ম দেয়ার অক্ষমতা, গর্ভপাত হওয়া, মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা পড়া।	চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, ম্যাঙ্গানিজ ধাতব লবণ

খনিজ পদার্থের নাম	যে বয়সের ছাগল আক্রান্ত হতে পারে	অভাবের কারণে পরিলক্ষিত লক্ষণ	খনিজ পদার্থের উৎস
১৪. মলিবডেনাম (Molybedinum)	সব বয়সের ছাগল	সাধারণত অভাব হয় না	মলিবেডেনাম লবণ
১৫. দস্তা (Zinc)	বাচ্চা ছাগল	বড় হয় না, স্ত্রী ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।	ভূষি, ছোলা ও ডাল-জাতীয় খাদ্য, দস্তা ৪০-১০০ মিলি গ্রাম প্রতি টন খাদ্যের সাথে।
১৬. সেলেনিয়াম (Selenium)	বাচ্চা ছাগল	মাংস সাদা হয়ে যায়।	ভিটামিন ই অথবা সেলেনিয়াম।

ছাগলের খনিজ পদার্থের চাহিদা কম-বেশি হয়ে থাকে এবং এর উপর ভিত্তি করে খনিজ পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যেমন বড় বৃহৎখনিজ (Macrominerals), ছোট বা অণুখনিজ (Microminerals)

সারণির ক্রমিক নং ১-৭ পর্যন্ত খনিজ পদার্থগুলো বৃহৎখনিজ পর্যায়ের অর্থাৎ এগুলোর পরিমাণ একটু বেশি প্রয়োজন। সারণি ১১-এ উপস্থাপিত ৮ থেকে ১৬ পর্যন্ত ক্রমিকে উল্লিখিত খনিজ উপাদানগুলো মাইক্রো পরিমাণে (কম পরিমাণে) প্রয়োজন। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু খনিজ উপাদান রয়েছে যা খুবই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন তাদেরকে ট্রেস এলিমেন্ট (Trace elements) বলে, যেমন — বেরিয়াম (Barium), ব্রোমিন (Bromine), ক্যাডমিয়াম (Cadimium), ক্রোমিয়াম (Chromium), নিকেল (Nickle), স্ট্রনশিয়াম (Strontium) এবং টিন (Tin) ।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

খনিজের মতোই ছাগলের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদান বৃদ্ধিতে ভিটামিনের প্রয়োজন। তেল বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হচ্ছে -

ভিটামিন এ (A) (Retinol) ক্যারোটিন (Carotene) হিসেবে গাছ ও ঘাসে পাওয়া যায়।

ভিটামিন ডি$_1$ (D_1) আরগোক্যালসিফেরল (Ergocalceferol), ভিটামিন ডি৩ (D3)- কলিক্যালসিফেরল (Cholecalciferol), ভিটামিন ই (E)- টকোফেরল (Tocopherols), ভিটামিন কে (K)- ফাইলোকুইনোন (Phyloquinone)

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হচ্ছে —

১) ভিটামিন বি$_1$ (Vitamin B_1) -থায়ামিন (Thiamine)
২) ভিটামিন বি$_2$ (Vitamine B_2) -রিবোফ্লেভিন (Riboflavine)
৩) ভিটামিন বি$_6$ (Vitamine B_6) -পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)
৪) ভিটামিন বি $_{12}$-(Vitamine B_{12}) কোবালামিন (Cobalamin)
৫) প্যান্টোথেনিক এসিড (Pantothenic acid)
৬) বায়োটিন (Biotin)
৭) কোলিন (Choline)
৮) ফোলিক এসিড (Folic acid)
৯) ভিটামিন সি (Vitamine C) বা অ্যাসকরবিক এসিড (Ascarbic acid)

অধিকাংশ ভিটামিনই ছাগলের খাদ্যে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানে, সবুজ ঘাস এবং শাকজাতীয় ও ডালজাতীয় শষ্যে পাওয়া যায়। ভিটামিন বি$_{১২}$ ছাগলের অন্ত্রে অবস্থিত মাইক্রোফ্লোরাগুলো (Microflora) কোবাল্টজাতীয় (Cobalt) খনিজ পদার্থের উপস্থিতিতে তৈরি করতে পারে। ছাগলকে সুষম খাদ্য (Balanced ration) সরবরাহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খনিজ ও ভিটামিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

খাদ্যবস্তুর পরিপাক

খাদ্যগ্রহণ

ছাগল খাদ্যবস্তু গ্রহণকালে বড় বড় খাদ্য উপাদানগুলো দাঁত দিয়ে কেটে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে মুখ গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। দাঁতের সাহায্যে কর্তন, চর্বণ ও পেষণের সময় মুখের লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা রস (saliva) খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে পরিপাক প্রক্রিয়ার সূচনা করে। খাদ্য উপাদানের উপর সম্পূর্ণ পরিপাক প্রক্রিয়াটি কাজ করার পর খাদ্য উপাদানগুলো সরল উপাদানে পরিণত হয় যা শরীরের পুষ্টির জন্য উপযুক্ত হয়।

সারণি ১২ ঃ ছাগলের খাদ্য উপাদান ও সরল উপাদান

খাদ্য উপাদান	সরল উপাদান
১. আমিষ (proteins)	এমিনো এসিড (Amino Acids)
২. শর্করা (Carbohydrate)	গ্লুকোজ (Glucose)
৩. স্নেহজাতীয়/চর্বি/তেল (Fats + oils)	ফ্যাটি এসিড (Fatty acids) ও গ্লিসারল (Glycerol)

ছাগলের মুখবিবরে পরিপাক (Digestion in Mouth)

ছাগল তার অভ্যাসগত কারণে খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে এবং অবসর সময়ে তা পুনঃ চর্বণ (গিলিত চর্বণ Regargitation) করে। চর্বণকালে বর্ণহীন একপ্রকার তরল লালা-রস খাদ্যের সংস্পর্শে আসে যা অনেকটা অম্লীয় (acidic) এবং নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে গঠিত —

১। পানি (water)- এটি খাদ্যকে নরম করে।

২। মিউসিন (Mucin)- এটি খাদ্যকে পিচ্ছিল করে।

৩। টায়ালিন (Ptyalin)- এটি একটি উৎসেচক (enzyme) যা শর্করাজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ডেক্সট্রিন (Dextrine) ও মলটোজে (maltose) পরিণত করে।

মুখবিবরে আমিষ ও স্নেহজাতীয় (তেল/চর্বি) খাদ্যে কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না।

গলবিল (pharynx) ও অন্ননালীতে (oesophagus) খাদ্য উপাদানের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। গলবিল থেকে অন্ননালীতে খাদ্য বস্তু পৌছলে এর মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হয় ফলে খাদ্যবস্তু রুমেনে (rumen) চলে আসে। ছাগলের পাকস্থলীতে চারটি কুঠুরি (compartments) রয়েছে। রুমেন হলো এর প্রথম কুঠুরি। দ্বিতীয় কুঠুরি রেটিকুলাম (reticulum) রুমেন থেকে খাদ্যবস্তু রেটিকুলামে আসে। এই দুটি কুঠুরিতে একপ্রকার জীবাণু (micro-organisim) রয়েছে যেগুলো খাদ্য উপাদানকে ভাঙতে সাহায্য করে (Broken down by micro-organisms)। যখন ছাগল বিশ্রাম করতে থাকে তখন রুমেনে অবস্থিত খাদ্যবস্তুকে পুনরায় মুখবিবরে এনে এগুলোকে পুনঃচর্বন করে এবং তখন খাদ্যবস্তুর সাথে মুখের লালারস ভালভাবে মিশে। রুমেনকে খাদ্য গুদাম বলে

বিবেচনা করা হয় কারণ ছাগল তাড়াতাড়ি খাদ্যগ্রহণ করে সেগুলো এখানে এনে গুদামজাত করে রাখে এবং অবসর সময়ের পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলোর পুষ্টি শরীরের কাজে লাগায়। রুমেন এই খাদ্যবস্তু কিছু মিহি (refine) হয় যাতে অণুজীবগুলো খাদ্যের উপাদানের উপর ভালভাবে কাজ করতে পারে। রুমেনের নিচের অংশে পানি থাকে বিধায় রুমেনের চারনিং মোশনের (churning motion) সরল খাদ্য বস্তুগুলো ভেঙে যায়। যেসব খাদ্যবস্তু এই প্রক্রিয়ায় ভাঙে না সেগুলো পুনরায় মুখবিবরে ফিরে আসে এবং ছাগল এইগুলোকে চর্বণ করে এবং পরিপাক প্রক্রিয়া পুনরায় চলতে থাকে।

রুমেনে অণুজীব (Bacteria /yeast) খাদ্য বস্তুর উপর তিনভাবে কাজ করে –

(ক) মোটা আঁশ (crude fibre) কে পরিপাক করতে সাহায্য করা ঃ রুমেনে ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট (Yeast) দিয়ে তৈরি উৎসেচক (enzymes) এই জাতীয় খাদ্য বস্তুকে নরম করে। খাদ্যের আঁশগুলোকে আলাদা করে দেয় এবং সেলুলোজ (cellulose) থেকে জৈব এসিড (organic acid) তৈরিতে সাহায্য করে। এইসব এসিড হচ্ছে এসিটিক এসিড (Acetic Acid), প্রোপিয়নিক এসিড (Propionic Acid) এবং বিউটাইরিক এসিড (Butyric acid)। এইসব এসিড রুমেনর দেয়ালের মাধ্যমে পরিশোষিত হয়ে রক্ত প্রবাহে (Blood stream) মিশে যায়।

* ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট – রুমেনে এই বংশবৃদ্ধি করে কারণ এর তাপ, খাদ্য ও পানি এইসব অণুজীবের বংশবৃদ্ধির জন্য দরকার। এইসব অণুজীব দিয়ে রুমেনে খাদ্য বস্তুর গাঁজন প্রক্রিয়া (fermentation) শুরু হয়।

(খ) ছাগলের পাকস্থলীতে আমিষ তৈরির প্রক্রিয়া (Building up complete protein) : ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট উদ্ভিদজাতীয় উপাদান। এজন্য এরা প্রোটিনময় ও নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন (Non protein Nitrogen) থেকে শরীরে আমিষ তৈরি করতে পারে। যেহেতু কালক্রমে এই ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্টগুলো গুলে ছাগলের পাকস্থলীতে মারা যায়। সেজন্য পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইগুলোতে তৈরি আমিষ (proteins) ছাগলের নিজের শরীরের চাহিদার জন্য ব্যবহার করতে পারে। ছাগলকে সেই ইউরিয়া মিশ্রিত খাবার খাওয়ানো হয়ে থাকে, তাও সেইসব ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট দিয়ে ছাগলের গ্রহণযোগ্য আমিষে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এটি চক্রাকারে হতে থাকে।

(গ) রুমেনে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তৈরি (Manufacture of the B. complex Vitamines) ঃ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যেমন থায়ামিন (thiamine), রিবোফ্লোভিন (riboflavin), নায়াসিন (niacin), প্যান্টোথেনিক এসিড

(pantothenic acid), বায়োটিন (Biotin), ভিটামিন বি$_{১২}$ ইত্যাদি ভিটামিন রুমেনে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট তৈরি করতে পারে। ছাগলের রুমেনে তৈরি এসব ভিটামিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের রক্তের সাথে মিশে শরীরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, তবে রুমেনে তৈরি এইসব ভিটামিনের সবটুকু অংশ শরীরে শোষিত হয় না কিছু পরিমাণ গোবরের সাথে বের হয়ে আসে।

খাদ্যের গাঁজন ক্রিয়ার সময় (Fermentation process) ছাগলের পাকস্থলীতে কিছু গ্যাস তৈরি হয় এবং স্বাভাবিকভাবে এই গ্যাস বের হয়ে যায়, কিন্তু মাঝে মধ্যে এই গ্যাসের জন্য ছাগলের পেট শক্ত হওয়া রোগ (Bloat) হয়ে থাকে। এই সময় পেটে সেইসব গ্যাস তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে—

১। কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon di-oxide)
২। কার্বন মনোঅক্সাইড (Carbon mono-oxide)
৩। মিথেন (Methane)
৪। এমোনিয়া (Ammonia), হাইড্রোজেন (Hydrogen)
৫। হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen sulfide)

রেটিকুলাম (Reticulum) হচ্ছে ছাগলের পাকস্থলীর দ্বিতীয় কুঠুরি (Compertments)। এর ভেতর দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো তাই একে Honey comb ও বলা হয়ে থাকে। রুমেন থেকে রেটিকুলাম সম্পূর্ণ আলাদা না হওয়াতে রুমেন থেকে রেটিকুলামে ও পরে রেটিকুলাম থেকে রুমেনে খাদ্যবস্তু চলাচল করতে পারে। প্রথম পাকস্থলীর রুমেনের চারনিং প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তুর ভারি অংশগুলো রেটিকুলামে চলে আসে; এর ফলে খাদ্যের যাথে যদি কোন দাঁড়ানো বস্তু যেমন লোহার পেরেক বা তার বা নেইল, তা হলে তা রুমেন থেকে রেটিকুলামে এনে রেটিকুলামের দেয়ালে অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি করে এমনকি ছিদ্র পর্যন্ত করে ফেলে। এই ছিদ্রপথে দাঁড়ানো লোহার অংশটুকু হৃৎপিণ্ড ও আঘাত করে থাকে এবং এইক্ষেত্রে আক্রান্ত ছাগল মারা যায়। রেটিকুলামের কাজ হচ্ছে রুমেন থেকে খাদ্যবস্তুকে ওমেসামে (omasum) প্রেরণ এবং রুমেন থেকে খাদ্যনালীতে (oesophagus) খাদ্যবস্তু পুনঃ পাঠানোতে সাহায্য করা।

ছোবড়াজাতীয় খাদ্য এসিটিক এসিড উৎপাদনে সাহায্য করে যা দুধে ননীর উৎপাদনে প্রয়োজন। কম পরিমাণ ছোবড়াজাতীয় খাদ্য ও বেশি পরিমাণ দানাদার খাদ্য অধিক প্রোপিয়নিক এসিড (Propionic acid) তৈরিতে সাহায্য করে। যার ফলে দুধে ননীর পরিমাণ কম হয় (less butter fats)। ছোবড়াজাতীয় খাদ্যগুলো যদি মিহি কচি এবং অতিরিক্ত রসালো বা ভেজা হয় তাহলে দুধের ননীর স্বাদ কমে যাবে।

ওমেসাম (omasum)

এটি ছাগলের পাকস্থলীর তৃতীয় কুঠুরি (Compertments)। এটির দেয়ালের সংকোচন ক্ষমতা খুব বেশি। খাদ্যের পানির অংশটুকু নিংড়ানো ওমেসামের প্রধান কাজ। খাদ্যের অধিকাংশ পানি ও কিছু এসিড ওমেসামে শোষিত হয়। এখানে খাদ্যের শক্ত অংশের উপর পরিপাক ক্রিয়া চলে এবং এরপর ওমেসাম থেকে খাদ্যের বোলাস (bollus) এবোমাসামে চলে আসে। ছাগল যখন রোগে আক্রান্ত হয় তখন পাকস্থলীর কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। ফলে রেটিকুলাম থেকে কোন তরল পদার্থ ওমেসামে আসে না। তাই এখানে অবস্থিত খাদ্য উপাদানগুলো শক্ত (bloat) হয়ে যায় যাকে ইমপেকশন (Impaction) বলে।

এবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী

পাকস্থলীর এই কুঠুরি দেয়াল থেকে পরিপাক রস (gastric juice) নি:সৃত হয় যাতে রয়েছে – হাইড্রোক্লোরিক এসিড, পেপসিন (pepsin) এবং রেনিন (renin)। পেপসিন খাদ্যের অম্লত্ব অবস্থায় কাজ করে। তাই হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কাজ হচ্ছে খাদ্যের ক্ষারত্ব (alkalinity) কে অম্লত্বে (acidic) পরিবর্তন করা যাতে পেপসিন নামক উৎসেচক খাদ্যে পরিপাক ক্রিয়া করতে পারে। পেপসিন আমিষজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে পেপটাইডে (peptides) পরিণত করে কিন্তু এমাইনো এসিডে পরিণত করতে পারে না।

বাচ্চা ছাগলের পাকস্থলীর কাজ সাধারণত পাকস্থলীর মতো (simple stomach)। বাচ্চা ছাগলের পাকস্থলীর রেনিন নামক উৎসেচক থাকে যা দুধকে দই করে পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই উৎসেচক ছাড়া দুধ হজম হতে পারে না।

পাকস্থলীতে হজম বা পরিপাক ক্রিয়া (Digestion in the Stomach)

খাদ্য পরিপাক বা হজমের জন্য পাকস্থলী অন্যতম প্রধান অঙ্গ। খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে পৌছামাত্রই দ্রব প্রাচীর (from its wall) গ্রন্থি থেকে মিউকাস, পেপসিন ও অল্প পরিমাণে লাইপেজ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড নির্গত হয়ে পাচক রস (gastric juice) তৈরি করে। পরিপাক ক্রিয়া মুখবিবরে শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে পাকস্থলীতেই টায়ালিনের (ptyalin) কাজ ত্বরান্বিত হয়। এখানে যতোক্ষণ পর্যন্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নির্গত হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত শর্করাজাতীয় খাদ্য ভেঙে ডেক্সট্রিন (Dextrine), মলটেজ (moltase)-এ রূপান্তরিত হতে থাকে। পেপসিন পাকস্থলীতে পেপসিনোজেন (pesinogen) হিসেবে নিঃসৃত হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রভাবে পেপসিনে পরিণত হয়ে আমিষকে আংশিক বিশ্লিষ্ট করে প্রোটিওজ (proteose) ও পেপটোনে রূপান্তরিত করে। রেনিন নামক উৎসেচক দুধের আমিষকে জমাট বাঁধিয়ে কেসিনে (casin) পরিণত করে।

লাইপেজ (lipase) তেলজাতীয় খাদ্যবস্তুগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে ও গ্লিসারলে পরিণত করে। তবে পাকস্থলীতে কি পরিমাণ তেলজাতীয় পদার্থ ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

খাদ্য যতোক্ষণ পাকস্থলীর ভিতরে থাকে ততোক্ষণ পাচক রসের (gastric juice) সাথে মিশে পাকস্থলীর প্রাচীরের পেশীর সংকোচনের ফলে আন্দোলিত হয়ে ধীরে ধীরে অর্ধ তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় একে পাকমণ্ড (chyme) এবং অন্ত্রে (intestines) একে কাইল (Chyle) বলা হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরিপাক প্রক্রিয়া (Digestion in small intestines)

অধিকাংশ খাদ্য ডিওডেনামে পরিপাক হয়। এতে নিম্নলিখিত পরিপাক রস খাদ্যের সাথে মিশে বিভিন্ন বিক্রিয়া করে থাকে –

যকৃত রস ঃ যকৃত নিঃসৃত ক্ষারীয় পিত্তরস (bile) পিত্তনালীর (Bile duct) মাধ্যমে ডিওডেনামে এসে দুটি কাজ সমাধা করে –

(ক) স্নেহজাতীয় খাদ্যকে তরলীভূত করে ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত করে;

(খ) অগ্ন্যাশয় রসের (pancreatic juice) কর্মোপযোগী করার কাইমকে নিরপেক্ষ (neutral) করে তুলে।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juice) ঃ এটি অগ্ন্যাশয়ের ক্ষারীয় বহিঃনিঃসরণ। এতে নিম্নবর্ণিত উৎসেচক রয়েছে :-

১। ট্রিপসিন (Trypsine) ও কাইমোট্রিপসিন : এই দুটি উৎসেচকেই আমিষজাতীয় খাদ্যকে ভেঙে এমাইনো এসিড এ পরিণত করে।

২। লাইপেজ (Lipase) : এটি পিত্ত লবণের উপস্থিতিতে চর্বিজাতীয় পদার্থকে ফ্যাটি এসিড (Fatty acids) ও গ্লিসারলে (Glycerol) এ পরিণত করে।

৩। অ্যামাইলেজ (Amylase) : এটি শর্করাকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে।

পাকস্থলীর রস (Gastric juice)

এন্টেরোকাইনিন নামক হরমোনের প্রভাবে ডিওডেনামের গাত্র থেকে এই রস নিঃসৃত হয়। এতে নিম্নলিখিত উৎসেচক থাকে —

১। সুক্রোজ (Sucrase) : এটি সুক্রোজের (চিনির) উপর কাজ করে।

২। মলটেজ (Moltase)) : এটি মুখ থেকে আগত আংশিক পরিপাক হওয়া মলটোজের উপর কাজ করে।

৩। ল্যাকটেজ (Lactase) : এটি দুধের শর্করা (ল্যাকটোজের) এর উপর বিক্রিয়া করে। উপরোক্ত সব ডাইস্যাকারাইডই গ্লুকোজে পরিণত হয়।

৪। ইরেপসিন (Erapsine) : এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত করে।

খাদ্য বস্তুর পরিশোষণ

ডিওডেনামে খাদ্যবস্তু পরিপাকের সময় এগুলো ইলিয়ামে প্রবেশ করে। দ্রবণীয় এবং শোষণীয় খাদ্যকণাগুলো ইলিয়ামের গাত্রে পরিশোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য ও বর্জ্য অংশ বৃহদান্ত্রে আসতে থাকে। এখানে পানি শোষিত হওয়ার পর নমনীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ মলাশয়ে সাময়িকভাবে জমা থেকে পরে পায়ু দিয়ে বের হয়ে যায়।

সারণি ১৩ ঃ বিভিন্ন প্রকার পরিপাক উৎসেচক, এদের উৎস এবং কার্যকারিতার বিবরণ

উৎস	উৎসেচক	প্রভাবিত খাদ্য	জাত দ্রব্য
পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচক রস (gastric juice)	টায়ালিন (Ptyalin)	শর্করা	মলটোজ
	পেপসিন (Pepsin)	আমিষ	পেপটোন ও প্রোটিওজ
	রেনিন (Renin)	দুগ্ধ প্রোটিন	প্যারাক্যাসিন
আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রস	ইরেপসিন (Erepsin)	পেপটোন ও প্রোটিওজ	এমাইনো এসিড
	মলটেজ (Maltase)	মলটোজ	গ্লুকোজ
	সুক্রেজ (Sucrese)	সুক্রোজ (চিনি)	গ্লুকোজ
	ল্যাকটেজ (Lactase)	ল্যাকটোজ দুগ্ধ শর্করা	গ্লুকোজ
অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রস (Pancreatic juice)	ট্রিপসিন (Trypsin) কাইমোট্রিপসিন	পেপটোন ও প্রোটিওজ	এমাইনো এসিড
	এমাইলেজ (Amylase)	শর্করা	গ্লুকোজ
	লাইপেজ (Lipase)	চর্বি বা তেল	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

সারণি ১৪ ঃ আমিষজাতীয় (Proteins) খাদ্যের পরিপাক

পরিপাক অঙ্গ	পরিপাক পদ্ধতি
মুখ (mouth)	আমিষজাতীয় খাদ্য পরিপাক করার জন্য কোন উৎসেচক না থাকায় এখানে কোন পরিপাক ঘটে না।
পাকস্থলী (Stomachs)	পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে পেপসিনোজেন নিঃসৃত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (HCl) সাথে বিক্রিয়ার পর পেপসিনে পরিণত হয়। পেপসিন আমিষকে ভেঙে প্রোটিওজ ও পেপটোন নামক পলিপেপটাইডে পরিণত করে। বাচ্চা ছাগলের পাকস্থলীর রেনিন উৎসেচক দুগ্ধ আমিষকে প্যারাকেসিনে (paracacsin) পরিণত করে।
ক্ষুদ্রান্ত্র (Small instentine)	আন্ত্রিক রসের ইরেপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত করে। অগ্ন্যাশয় রসের নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেন আন্ত্রিক উৎসেচক এন্টেরোকাইনেজের সহায়তায় ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিনোজেনে পরিণত হয়। এগুলো আমিষ খাদ্যবস্তুকে ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত করে।
শোষণ	ইলিয়ামের (ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ) ভিলাইয়ের এমাইনো এসিড শোষিত হয়।
আত্মীকরণ	বিভিন্ন এমাইনো এসিড রক্তের সাথে মিশে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছায় এবং কোষের পুষ্টিসাধন করে।

সারণি ১৫ ঃ শর্করা (Carbohydrates) জাতীয় খাদ্যের পরিপাক

পরিপাক অঙ্গ	পরিপাক পদ্ধতি
মুখবিবর	মুখবিবরের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত লালা রসে টায়ালিন নামক উৎসেচক শর্করাকে ভেঙে মলটোজে পরিণত করে।
পাকস্থলী	পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে শর্করা পরিপাকের জন্য কোন উৎসেচক নিঃসৃত হয় না ফলে কোন পরিপাক ঘটে না।
ক্ষুদ্রান্ত্র	ডিওডেনামের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত উৎসেচকসমূহ বিভিন্ন ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে যথা – সুক্রেজ – সুক্রোজকে, মলটেজ – মলটোজকে ও ল্যাকটেজ– ল্যাকটোজকে (দুগ্ধ শর্করাকে) বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজে পরিণত করে।
শোষণ	ইলিয়ামের প্রাচীরের ভিলাইয়ের মাধ্যমে সাধারণত গ্লুকোজ শোষিত হয়ে রক্তের প্রবাহে নীত হয় এবং শরীরের শক্তি যোগায়।
আত্মীকরণ	গ্লুকোজ শ্বসনে জারিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন কাজের শক্তি যোগায়। অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে প্রধানত যকৃতে জমা থাকে। প্রয়োজনে এই জমাকৃত গ্লাইকোজেন ভেঙে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী শক্তি যোগায়।

সারণি ১৬ ঃ চর্বিজাতীয় খাদ্যের পরিপাক

অঙ্গের নাম	পরিপাক পদ্ধতি
মুখবিবর	কোন পরিপাক হয় না
পাকস্থলী	এখানে লাইপেজ চর্বি বা তেলজাতীয় খাদ্যের উপর খুব কম কাজ করে।
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় রসের লাইপেজ পিত্তরসের উপস্থিতিতে চর্বি বা তেল জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।
শোষণ	ইলিয়ামের প্রাচীরস্থিত কৈশিক নালীতে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল শোষিত হয়।
আত্মীকরণ	শোষিত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল শরীরের বিভিন্ন কাজে লাগে, এমনকি শরীরের কাজের জন্য শক্তি যোগায়। অতিরিক্ত চর্বি বা তেলজাতীয় খাদ্য আবার চর্বিতে পরিণত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে জমা থাকতে পারে।

সারণি ১৭ ঃ খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান

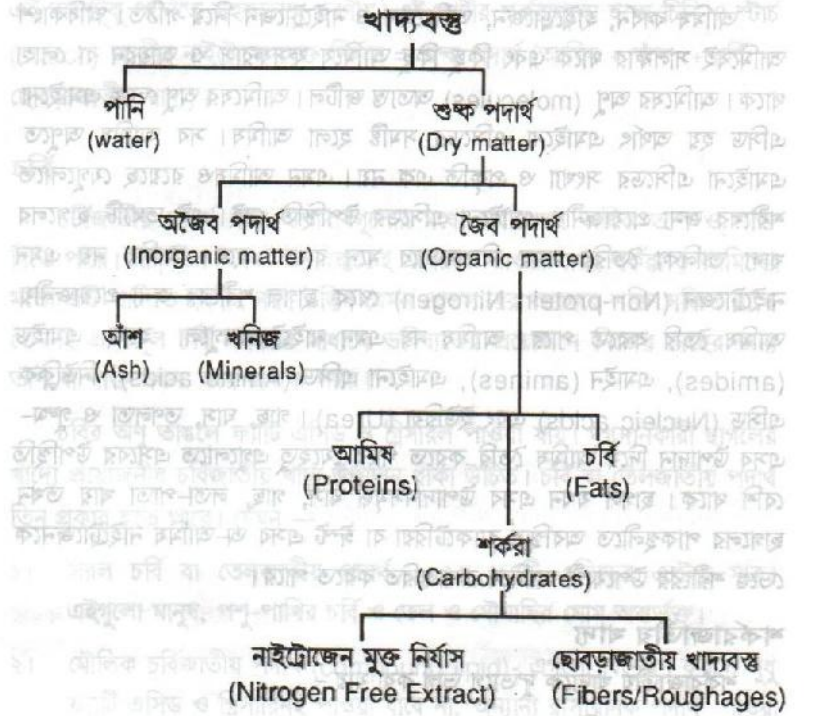

শুষ্ক পদার্থ (Dry matter) : একটি বস্তুকে তাপ দিতে থাকলে যখন এক বস্তুটি থেকে কোন জলীয় পদার্থ নির্গত হয় না সে অবস্থাকে শুষ্ক পদার্থ বলে। তাপ দেয়ার ফলে জলীয় অংশ চলে যাওয়ায় পদার্থটির ওজন কমে, কিন্তু যখন জলীয় পদার্থ নির্গত হয় না। তখন বস্তুটির ওজন কমে না এবং ঐ অবস্থাটি বস্তুটির শুষ্ক অবস্থা। শুষ্ক পদার্থ জৈব ও অজৈব হতে পারে। জৈব পদার্থ আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন- আমিষ, শর্করা ও চর্বি।

জৈব পদার্থ (Organic matter) ঃ জৈব পদার্থ হচ্ছে –

(ক) আমিষ (Protein)

(খ) শর্করা (Carbohydrate)

(গ) চর্বি (Fats)

আমিষজাতীয় খাদ্য

আমিষ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ আমিষেই সালফার থাকে এবং কিছু কিছু আমিষে ফসফরাস ও আয়রন বা লোহা থাকে। আমিষের অণু (molecules) অত্যন্ত জটিল। আমিষের অণু ভেঙে এমাইনো এসিড হয় অর্থাৎ এমাইনো এসিডের সমষ্টি হলো আমিষ। সব আমিষ অণুতে এমাইনো এসিডের সংখ্যা ও প্রকৃতি এক নয়। এমন আমিষও রয়েছে যেগুলোতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডের উপস্থিতি নেই। এই তথ্যটি ছাগলের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমিষ নয় এমন নাইট্রোজেন (Non-protein Nitrogen) থেকে ছাগল শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ তৈরি করতে পারে। আমিষ নয় এমন নাইট্রোজেনগুলো হচ্ছে এমাইড (amides), এমাইন (amines), এমাইনো এসিড (Amino acids), নিউক্লিক এসিড (Nucleic acids) এবং ইউরিয়া (Urea)। গাছ, ঘাস, তৃণলতা ও গুল্ম– এসব উপাদান দিয়ে আমিষ তৈরি করতে পারে যেহেতু এগুলোতে এসবের উপস্থিতি বেশি থাকে। ছাগল যখন এসব উপাদানসমৃদ্ধ ঘাস, গাছ, লতা-পাতা খায় তখন ছাগলের পাকস্থলীতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া বা ঈস্ট এসব অ-আমিষ নাইট্রোজেনকে ভেঙে শরীরের উপযোগী আমিষে রূপান্তরিত করতে পারে।

শর্করাজাতীয় খাদ্য

শর্করাজাতীয় খাদ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় –

(ক) ছোবড়াজাতীয় (Fibers)

(খ) নাইট্রোজেনমুক্ত নির্যাস (Nitrogen Free Extract)

(ক) ছোবড়াজাতীয় খাদ্য (Fibers)

(১) হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose)

(২) সেলুলোজ (Cellulose)

(৩) প্যাস্টুসেন্স (Pestusans)।

সেলুলোজজাতীয় খাদ্য ছাগলের পাকস্থলীতে অবস্থানরত ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট ভেঙে শরীরের পুষ্টি উপযোগী করতে পারে বিধায় ছোবড়াজাতীয় খাদ্য ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

শর্করাজাতীয় খাদ্যে – কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উপস্থিতি পানিতে এদের অবস্থান যে অনুপাতে সে অনুপাতে – যেমন CHO.

(খ) নাইট্রোজেনমুক্ত নির্যাস (Nitrogen Free Extract)- শর্করা খাদ্যের এই অংশটুকু পানিতে সহজভাবে দ্রবণীয়। এই শ্রেণীর শর্করাগুলো হচ্ছে চিনি ও স্টার্চ (starch) জাতীয় নাইট্রোজেনমুক্ত নির্যাস = শুষ্ক পদার্থ (আমিষ + আঁশ + চর্বি + ছোবড়াজাতীয় খাদ্য)।

চর্বি

চর্বিজাতীয় পদার্থ খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি দিতে পারে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যবস্তুতেই এদেরকে পাওয়া যায়। শর্করা ও আমিষের মতো এটি পানিতে দ্রবণীয় নয়। উদ্ভিদ যেমন শ্বেতসারের আকারে শক্তি সঞ্চিত রাখে তেমনই প্রাণিকূল চর্বি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে নিজের দেহের জন্য তাপ বা শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

চর্বির অণু ভাঙলে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়। দুগ্ধদানকারী ছাগলের খাদ্যে প্রয়োজনীয় চর্বিজাতীয় খাদ্য উপাদান থাকা উচিত। চর্বি বা তেলজাতীয় পদার্থ তিন প্রকার হতে পারে। যেমন —

১। সরল চর্বি বা তেলজাতীয় পদার্থ – এরা ফ্যাটি এসিডের এস্টার মাত্র। এইগুলো মানুষ, পশু-পাখির চর্বি ও তেল ও মৌমাছির মোম অন্তর্ভুক্ত।

২। মৌলিক চর্বিজাতীয় পদার্থ (compound lipid)- এগুলো বিশ্লেষণ করলে শুধু ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিনই পাওয়া যাবে না, অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যাবে। এগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) ফসফোলিপিড (Phospholipid) – এতে থাকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফেট।

(খ) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid)-এর সাথে শর্করা অণু বিদ্যমান।

(গ) সালফোলিপিড (Sulfulipid) চর্বির সাথে সালফার অণুর সংমিশ্রণ থাকে।

(ঘ) লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) চর্বির সাথে আমিষ বা প্রোটিনের অণু সংযুক্ত থাকে।

৩। উদ্ভূত চর্বি ও চর্বিজাত পদার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পদার্থ (Derived lipid & other substances).

চর্বি ও তেল উভয়ই গ্লিসারল নামক জৈব এলকোহলের সাথে ফ্যাটি এসিডের এস্টার। এদের গঠন নিম্নরূপ —

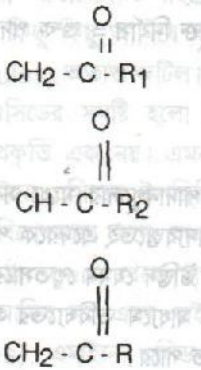

চর্বি বা তেল

চর্বি বা তেল উভয়ই ট্রাইগ্লিসারাইড। এখানে একটি গ্লিসারল অণুর সাথে তিনটি ফ্যাটি এসিডের অণু মিশে বলে একে ট্রাই-গ্লিসারাইড (Triglyceride) বলা হয়।

ছাগলের খাদ্য

ছাগলের বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খাদ্যগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই গর্ভে থাকাকালীন ছাগলের বাচ্চা মায়ের শরীর থেকে খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ করে। বাচ্চা প্রসবের পর পর উলানের প্রথম দুধ অর্থাৎ কলোস্ট্রাম (colostrum) বাচ্চাকে খাওয়ালে রোগ বালাই কম হয়।

তাই বাচ্চা প্রসবের পর উলানের প্রথম দুধটি অবশ্যই বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। অনেক এলাকায় ছাগলের প্রথম দুধটি ফেলে দেয়া হয় তা করা উচিত নয়। প্রথম দুধ খাওয়ালে বাচ্চার খাদ্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। এই দুধে প্রচুর ভিটামিন 'এ' রয়েছে এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি (antibody) রয়েছে যা সীমিত সময়ের জন্য, জীবনের প্রথম কয়েকদিন, রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বাসা-বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় যেসব ছাগল আমাদের দেশে পালন করা হয়ে থাকে সেসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মে মা ছাগলই বাচ্চাকে সুনির্দিষ্ট সময়ের পর দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দুধ উৎপাদনের জন্য (dairy goats) যেসব ছাগল পালন করা হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে অধিক দুধ সংগ্রহের জন্য বাচ্চাকে দুধ খাওয়া ছাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তবে যেসব ছাগল মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়ে থাকে এদের বাচ্চাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুধ খেতে দেয়া ভাল। সব কিছুই নির্ভর করছে খামারের অন্য

ধরনের খাবার সরবরাহের উপর। তবে ছাগলের বাচ্চার বয়স তিন মাস হলেই দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। দৈনিক একটি স্ত্রী বাচ্চা ছাগলকে এক লিটার ও একটি পাঠা বাচ্চা ছাগলকে ১.৫০ লিটার দুধ খাওয়ানো উচিত। ছাগলের একটি অভ্যাস আছে যে, এরা অতি অল্প বয়সে ছোট ছোট কচি ঘাস খেতে পারে যা গো-মহিষের বাচ্চারা পারে না। এটি সম্ভব হয় ছাগলের জিহ্বার বৈশিষ্টের জন্য। ছাগল ছোবড়াজাতীয় খাদ্য থেকে গো-মহিষের মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই ছাগলের খাদ্যে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ ও ভিটামিন থাকতে হবে। দুধ দেয় এমন ছাগলের খাদ্যে খাবারে লবণ অবশ্যই দিতে হবে। আমাদের দেশে অনেকের ধারণা ছাগল পানি পান করে না। এই ধারণা সঠিক নয়। ছাগল যাতে প্রয়োজনমতো পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটি ১৮-২০ কেজি ওজনের ছাগল দৈনিক আধা লিটার থেকে এক লিটার পর্যন্ত পানি পান করে থাকে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে 'ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়'।

এই প্রবাদ বাক্যটি থেকে ছাগলের খাদ্যাভ্যাসের একটি পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। তবে বাসা-বাড়িতে মাঠে চড়িয়ে ছাগল পালন আর খামারে ছাগল পালন এক কথা নয়। খামারে ছাগল পালন করতে হলে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য ছাগলকে অবশ্যই দিতে হবে। ছাগলের খাদ্য তৈরির সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন খাদ্যে ব্যবহৃত উপাদানটি সহজলভ্য ও সস্তা হয়।

ছাগলের কি পরিমাণ পুষ্টির দরকার তা নিচে দেয়া হলো -

শুষ্ক পদার্থ (Dry matter)	মাংসের জন্য পালিত ছাগলের শরীরের ওজনের ২৫-৩০% দুধের জন্য পালিন ছাগলের শরীরের ওজনের ৮%।
শক্তি (Energy) শর্করা	শরীর পরিচালনার জন্য ৭-৮ গ্রাম/কেজি শরীরের ওজনের জন্য/দিন (for maintenance) (শর্করা সমতুল্য)। প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য দৈনিক ৩০০ গ্রাম (শর্করা সমতুল্য)/দিন।
আমিষ	শরীর পরিচালনার জন্য প্রতি ১০ কেজি শরীরের ওজনের জন্য ৪-৫ গ্রাম।
পরিপাকযোগ্য আমিষ (Digestable crude proteins)	প্রতিদিন প্রতি কেজি দুধের জন্য ৭০ গ্রাম।

BANSDOC Library
Accession No. 18657

শুষ্ক পদার্থ (Dry matter) ও পানি গ্রহণের আনুপাতিক হার ১ঃ৪ মাংসের জন্য পালিত ছাগলের খাদ্যে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে শরীরের ওজনের শতকরা তিনভাগ অথচ দুগ্ধবতী ছাগলের জন্য এর পরিমাণ হচ্ছে শরীরের ওজনের শতকরা ৮ ভাগ। এ্যাংগলো নিউবিয়ান ও বৃটিশ অ্যালপাইন ছাগলের জন্য শুষ্ক পদার্থের দরকার এদের শরীরের ৪.১% – ৫.১%।

দুগ্ধবতী ছাগলের দুধ উৎপাদন ও দুধে ননীজাতীয় (চর্বি) পদার্থের উপস্থিতির হারের উপর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে ছাগলের দুধে ননীর উপস্থিতির শতকরা হার ৩.৮–৫.৫ ধরে সারণি ১৮–এ দুগ্ধবতী ছাগলের বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের চাহিদার পরিমাণ দেখানো হলো। প্রতি ছাগলের দুধ উৎপাদন ধরা হয়েছে দৈনিক এক কেজি।

সারণি ১৯ ঃ ছাগলের পুষ্টির চাহিদা

দুধে ননীর উপস্থিতি(%)	শর্করা সমতুল্য SE (গ্রাম)	মোট পরিপাক যোগ্য পুষ্টি (TDN) (গ্রাম)	পরিপাক শক্তি (DE) (MJ)	বিপাকীয় শক্তি (ME (MT)	পরিপাক যোগ্য আমিষ (P) (গ্রাম)	ক্যালসি-য়াম (Cal) (গ্রাম)	ফস-ফরাস (P) (গ্রাম)
৩.৫	২৬২	৩০১	৫.৫২	৪.৫৩	৪৭	০.৮	০
৪	২৮০	৩২২	৫.৯৪	৪.৮৭	৫২	০.৯	০.৭
৪.৫	২৯৬	৩৪০	৬.২৮	৫.১৫	৫৯	০.৯	০.৭
৫	৩১৪	৩৬১	৬.৬৫	৫.৪৫	৬৬	১.০	০.৭
৫.৫	৩৩১	৩৮০	৬.৯৯	৫.৭৩	৭৩	১.১	০.৭

SE = Starch equivalent.
TDN = Total Digestable Nutrients = মোট পরিপাকযোগ্য পুষ্টি ।
DE = Digestible energy = পরিপাকযোগ্য শক্তি।
ME = Metablisable energy = বিপাকীয় শক্তি
ME = DE x o.82 = বিপাকীয় শক্তি।
DP = Digestible protein = পরিপাকযোগ্য আমিষ।
সূত্র : দেবেন্দ্র , ১৯৮৬

ছাগলের জন্য কয়েকটি সুষম খাদ্যের তালিকা নমুনা হিসেবে নিচে দেয়া হলো–

বয়স্ক ছাগলের জন্য

১।	কুঁড়ো (Rice bran)	২০%
	আটা (Wheat Flour)	৮%
	ঝোলাগুড় (Molasses)	৬%
	নারকেলের খৈল (Coconut cake)	৫৫%
	তিলের খৈল (seasame cake)	৬%
	শুটকি (Dry Fish)	৩%
	খনিজ মিশ্রণ (Mineral mixture)	২%

* ছাগলকে প্রতিদিন ২৩০ গ্রাম ও পাঠাকে প্রতিদিন ৪৫০ গ্রাম করে দিতে হবে।

২।	কুঁড়ো	৩০%
	আটা	৪০%
	ঝোলাগুড়	২%
	নারকেলের খৈল	১০%
	বাদামের খৈল	১২%
	খনিজ মিশ্রণ	২%

* প্রতি ছাগলকে (মাংসের জন্য /দুধের জন্য) উভয়কেই খাদ্য দিতে হবে ৪৫০ গ্রাম/দিন
* ছাগলকে সকাল-বিকাল মাঠে চড়াতে হবে।
* প্রয়োজনমতো গিনি ঘাস খেতে দিতে হবে।

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

৩।	ভূট্টা ভাঙা	৫৫%
	কুঁড়ো	২২.৫%
	নারকেলের খৈল	১০%
	সয়াবিন মিল	৫%
	শুটকি	৭.৫%

* শরীরের ওজনের শতকরা একভাগ প্রতিদিন খাওয়াতে হবে।

৪।	গমভাঙা	২০%
	গুড়	২০%
	নারকেলের খৈল	৩২%
	সয়াবিন মিল	১০%
	সাইট্রাস মিল	১৫%
	খনিজ মিশ্রণ	৩%

দুই কেজি দুধ দেয় এমন ছাগলকে প্রতিদিন ৯০০ গ্রাম করে খাওয়াতে হবে। একইসাথে প্রয়োজন মাফিক নেপিয়ার বা গিনি ঘাস খেতে দিতে হবে। এটি নিবিড় ও অর্ধনিবিড় খামারের জন্য বেশ উপযুক্ত।

* দানাদার খাদ্যের শতকরা একভাগ খাবার লবণ মিশাতে হবে।

৫।	ছোলা	১৫%
	ভুট্টা	৩৭%
	তিল/চীনাবাদামের খৈল	২৫%
	গমের ভুষি	২০%
	খনিজ মিশ্রণ	২.৫%
	লবণ	০.৫%
		১০০ ভাগ

প্রতি ছাগলের জন্য দৈনিক ১৫০ গ্রাম
প্রতি লিটার দুধের জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম

প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পাঠার জন্য (Breeding buck) দৈনিক ৫০০–১০০০ গ্রাম। বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। এজন্য দৈনিক ২–৩ কেজিই যথেষ্ট।

৬। বাচ্চা ছাগলের জন্য খাদ্য তালিকা

ছোলা ভাঙা	২০%
ভূট্টা ভাঙা	২২%
তিল বা চীনাবাদামের খৈল	৩৫%
গমের ভূষি	২০%
খনিজ মিশ্রণ	২.৫%
লবণ	০.৫%

৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৫০ গ্রাম / দিন

৬ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০০ গ্রাম / দিন

৭ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩৫০ গ্রাম/দিন

এ ছাড়া প্রয়োজনমাফিক মায়ের দুধ বা অন্য দুধ খেতে দিতে হবে।

৭। গম বা ভূট্টা ভাঙা ৪৫%

চালের কুঁড়ো	২০%
গমের ভূষি	১৫%
বাদামের খোসা বা ডালের ভূষি	১০%
সয়াবিনের গুঁড়ো বা গুঁড়ো দুধ	৮%
খনিজ মিশ্রণ	২%
	১০০ ভাগ
+ লবণ	১ ভাগ

একটি স্ত্রী ছাগলকে দৈনিক ২৩০ গ্রাম এবং একটি পুরুষ ছাগলকে দৈনিক ৪৫০ গ্রাম খেতে দিতে হবে। সীমিত চড়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সকাল-বিকাল মাঠে চড়ানো হয় এমন ছাগলকে দৈহিক ওজনের শতকরা ৯ ভাগ দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় ছাগল পালন করা হলে স্ত্রী ছাগলকে প্রতি লিটার দুধের জন্য দৈনিক ৪৫০ গ্রাম করে দানাদার খাদ্য দিতে হবে। সাথে প্রয়োজনমাফিক কাঁচা ঘাস দেয়া যেতে পারে।

ছাগলের খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

ছাগলের খাদ্য উপাদানের উৎসের উপর ভিত্তি করে এদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায় –

১। শস্য

২। শস্য থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান

৩। ঘাস

৪। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি খাদ্যবস্তু যেমন নাইট্রোজেন থেকে ইউরিয়া তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি প্রোটিন কনসেনট্রেট (Protein concentrates)।

ছাগলের খাদ্য উপাদানসমূহকে প্রথম দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

১। ছোবড়াজাতীয় খাদ্য (Roughages)

২। দানাদার খাদ্য (Concentrates)

ছোবড়াজাতীয় খাদ্যকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

(ক) শুষ্ক ছোবড়াজাতীয় খাদ্য (dry roughages)

(খ) সতেজ রসালো ছোবড়াজাতীয় খাদ্য (succulents roughages) : এই জাতীয় খাদ্যে পানির ভাগ থাকে ৭৫–৯৫ ভাগ।

ছোবড়াজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে ঘাস বা শাক (forage), জটিল পাকস্থলীসম্পন্ন (compound stomach) ছাগল ছোবড়াজাতীয় খাদ্য থেকে অধিক পরিমাণে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে যা সরল পাকস্থলীসম্পন্ন (simple stomach) প্রাণীরা পারে না।

দানাদার খাদ্যে ছোবড়ার (fibers) পরিমাণ কম থাকে। প্রত্যেক বস্তুতে নিম্নলিখিত উপাদানের উপস্থিতি থাকে। তবে এক এক বস্তুতে এক এক হারে থাকে বিধায় খাদ্যমানের তারতম্য হয়ে থাকে।

(ক) পানির অংশ

(খ) শুষ্ক পদার্থ

পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পানি দেহের রক্তের পানির অংশ ও অন্যান্য উপাদানে পানির সরবরাহের পরিমাণ ঠিক রাখে। পানির অভাবে দেহের রক্তের পানির অংশ কমে গিয়ে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল ব্যাহত করে এবং দেহের বিভিন্ন কোষের পুষ্টিপ্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে, ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় এবং এই অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে প্রাণীটি মারা যায়। পানির মাধ্যমেই দেহের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের হয়ে আসে।

পানি দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ছাগলের দেহে পানির উপস্থিতির পরিমাণ বয়সের উপর নির্ভরশীল। সদ্য প্রসবকৃত ছাগলের বাচ্চার দেহের ওজনের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ পানি থাকে। স্বাস্থ্যবান একটি বয়স্ক ছাগলের দেহে পানির পরিমাণ থাকে ৫০ ভাগ কিংবা তারও কম।

ছাগলের পানি গ্রহণের পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা, আবহাওয়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। দুধ ও পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জন্য প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার রোগ-জীবাণুমুক্ত পানির দরকার। মাংস উৎপাদনের জন্য পালিত ছাগলের অপেক্ষাকৃত কম পানি গ্রহণ করে থাকে।

গ্রীষ্মমণ্ডলের ছাগল পানির স্বল্পতাকে আত্মস্থ (adapted) করতে পারে অর্থাৎ আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। শুষ্কতাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছাগলের রয়েছে। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ৩৮° সেঃ বলে ছাগল হাঁপাতে থাকে কিন্তু ছাগল ঘামে না। গোবরে পানির অংশ কমে যায়, ফলে প্রস্রাব কম হয়। পূর্ব আফ্রিকার ছাগল চকচকে চামড়া দিয়ে তাপ গ্রহণ করে দেহকে তাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ছাগলের পানি ও শুষ্ক পদার্থ গ্রহণের আনুপাতিক হার বেড়ে যায়। ছাগল সাধারণত তিনটি উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকে—

১। পানির স্বাভাবিক সরবরাহ থেকে,

২। খাদ্যবস্তুর পানির অংশ থেকে

৩। দেহে চর্বিজাতীয় পদার্থ জারণের মাধ্যমে (Oxidation of fats within the body)।

এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মালয়েশিয়ার একটি খামার মাংসের জন্য পালিত একটি ক্যাটজাং (Katjang) জাতের ছাগল দৈনিক ৬৮০ মিলিলিটার পানি পান করে। দিনের বেলায় পান করে ৫৫০ মিলিলিটার ও রাতে পান করে ১৩০ মিলিলিটার। এতে

দেখা যায় যে ছাগল প্রয়োজনে রাতেও পানি পান করে থাকে।

বাংলাদেশে গরমকালে একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগল দৈনিক আধা লিটার থেকে এক লিটার পরিমাণ পানি পান করে থাকে।

শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলে (arid/semi-arid/dry tropics) একটি বয়স্ক ছাগল দৈনিক ৪.৫ লিটার পর্যন্ত পানি পানি করে থাকে।

বৃষ্টির সময় ঘাসে পানির পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় গরম আবহাওয়া সত্ত্বেও ছাগল এইসময় কম পরিমাণ পানি গ্রহণ করে থাকে।

মাঠে চড়ে যেসব ছাগল খাদ্যের অন্বেষণ করে খায় এদের খাদ্যের ও পানির চাহিদার পরিমাণ খামারে পালিত ছাগল থেকে বেশি হয় কারণ এই ঘোরাঘুরির জন্য শক্তি ব্যয় হয়।

শুষ্ক পদার্থ

শুষ্ক পদার্থ দু'ধরনের হতে পারে। যেমন —

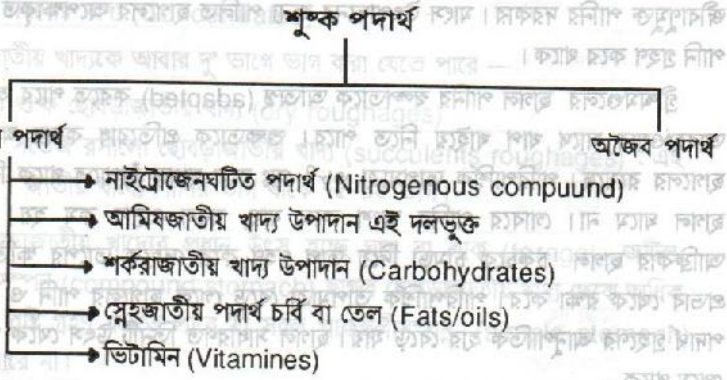

১। নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ (Nitrogenous compound)

নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ বলতে বোঝায় প্রোটিন বা প্রোটিন নয় এমন ধরনের নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ যেমন এমাইনো এসিড। এমাইন এমাইড বা নাইট্রেট ও এ্যালকলয়েড ইত্যাদি।

আমিষ একটি জটিল উপাদান। এইগুলো জীবিত কোষে বিদ্যমান এবং কোষের সবধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে। শরীরের সমস্ত নরম অবকাঠামো (soft structures) আমিষ দিয়ে তৈরি। সমস্ত উৎসেচক, হরমোন (hormones) রক্তের হিমোগ্লোবিন, রোগ প্রতিরোধ শক্তি (antibodies) সবই আমিষ দিয়ে গঠিত।

আমিষের সূক্ষ্মতম অংশ হচ্ছে এমাইনো এসিড। বহু সংখ্যক এমাইনো এসিড একের পর এক যুক্ত হয়ে আমিষ গঠন করে। একটি এমাইনো এসিডের এসিড দল R—COOH পার্শ্ববর্তী এমাইনো এসিডের এমাইনো <—NH_2 দলটির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি পানির অণু বিচ্যুত করে পরস্পর সংযোগ স্থাপন করে। এইরূপ সংযুক্তির নাম পেপটাইড বন্ধনী। এই প্রকার প্রধান বন্ধনী ছাড়া আরও নানাপ্রকার বন্ধনী দিয়ে এমাইনো এসিডগুলো আমিষ অণুতে যোগ হয়। নিচে একটি এমাইনো এসিডের সাধারণ গঠন প্রণালী দেখানো হলো —

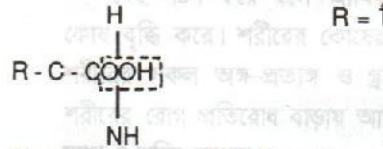

কিভাবে পেপটাইড বন্ধনীর সৃষ্টি হয়

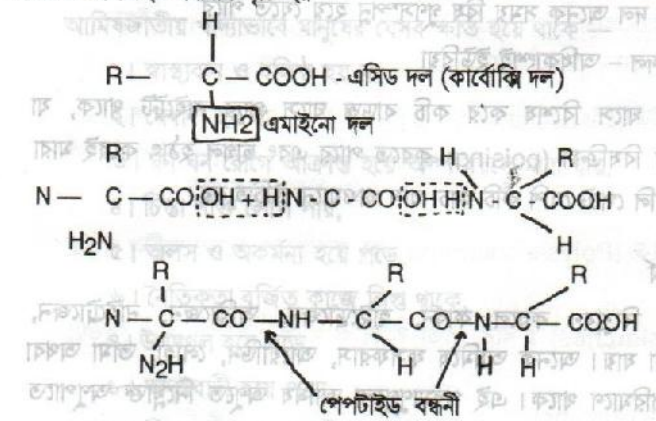

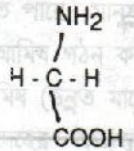

অথবা

জটিল আইসোলিউসিন (Isoleucine) দল হতে পারে, যেমন

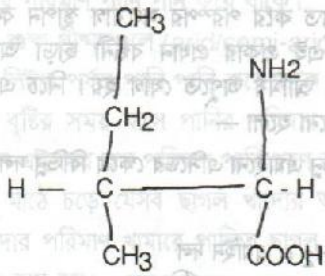

অ্যামাইনো দল অনেক সময় বিষ গুণসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে

অ্যামাইড দল – অধিকাংশই ইউরিয়া

নাইট্রেট ঃ ঘাসে বিশেষ করে কচি বাড়ন্ত ঘাসে প্রচুর নাইট্রেট থাকে, যা রূপান্তরিত হয়ে বিষক্রিয়া (poising) করতে পারে এবং ছাগল হঠাৎ করেই মারা যেতে পারে। খালি পেটে বেশি কচি কাচা ঘাস খাওয়ানো উচিত নয়।

আমিষের ধর্ম

আমিষকে বিশ্লেষণ করলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার পাওয়া যায়। অনেক আমিষে ফসফরাস, আয়োডিন, লোহা, তামা অথবা দস্তা সামান্য পরিমাণে থাকে। এই পরমাণুগুলো আমিষ অণুতে নিম্নোক্ত অণুপাতে বিদ্যমান থাকে।

মৌলিক পদার্থ	শতকরা ওজন
কার্বন	৫০
হাইড্রোজেন	৭
অক্সিজেন	২৩
নাইট্রোজেন	১৬
সালফার	০–৩
ফসফরাস	০–৩

বিভিন্ন ধরনের আমিষ বিভিন্ন দ্রবণে দ্রবণীয় হয়ে থাকে। এদের মধ্যে, পানি, অ্যালকোহল, লঘু লবণাক্ত পানি (weak salt solution) এসিডও বেশ উল্লেখযোগ্য। আমিষের অণুগুলোর আকার বড় হওয়ায় এইগুলো অর্ধভেদ্য পর্দার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না।

ছাগলের খাদ্যে আমিষজাতীয় খাদ্যোপাদানের প্রয়োজনীয়তা

দেহ গঠন করে বলে আমিষসমৃদ্ধ খাদ্যকে দেহগঠনের খাদ্য বলে। শরীরের কোষ বৃদ্ধি করে। শরীরের কোষের ক্ষয়পূরণ করে। শরীর কোষকে সতেজ রাখে, শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিকে কার্যক্রম রাখে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ বাড়ায় আমিষ শরীরের ভিতর সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি যোগায়।

আমিষজাতীয় খাদ্যাভাবে মানুষের যেসব ক্ষতি হয়ে থাকে —

১। স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ হয় না,

২। মেধাবী হয় না,

৩। ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মারা যায়,

৪। চিন্তা শক্তি লোপ পায়,

৫। অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে,

৬। নৈতিকতা বর্জিত কাজে লিপ্ত থাকে,

৭। উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে,

৮। অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে,

৯। শিশুর মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে আমিষ নাইট্রোজেন হিসেবে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত রয়েছে। উদ্ভিদ মাটিতে অবস্থিত নাইট্রোজেন বহুল সরল অজৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে আমিষ তৈরি করতে সক্ষম। জীবজগত এইভাবে আমিষ তৈরি করতে পারে না বলে এরা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আমিষের এমাইনো এসিড দিয়ে নিজস্ব আমিষ তৈরি করতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ আমিষ থেকে যেমন নিজের আমিষ গঠন করে তেমনই গবাদি পশু-পাখি, মাংস, ডিম বা দুধ থেকে উপযুক্ত আমিষ (উন্নত মানের আমিষ) গ্রহণ করে সেই উদ্ভিদেরই উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের অভ্যন্তরে বিপাক হয়ে

আমিষজাতীয় পদার্থ, নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থে পরিণত হয় এবং মলমূত্র হিসেবে নির্গত হয়ে যায়। এইসব মল, মূত্র ও মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ থেকে নাইট্রোজেন এসে মৃত্তিকাকে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ করে। এতে উদ্ভিদরাজি আমিষ তৈরি করার উপাদান পায়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে নাইট্রোজেন তথা আমিষের ক্ষয় নেই। বিভিন্ন অবস্থায় এইগুলো পৃথিবীতে অবস্থান করে। এটি চক্রাকারে মাটি থেকে উদ্ভিদ তারপর জীব ও শেষে আবার মাটিতে ফিরে আসে। একে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

শর্করাজাতীয় খাদ্য

শর্করাজাতীয় খাদ্য উপাদানকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় —

১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides) ঃ এগুলো ৫-৬ কার্বন সুগার যথা- রাইবোজ (Ribose- $C_5H_{10}O_5$), গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)। এইগুলো ছাগল সহজে হজম করতে পারে।

২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides) $C_{12}H_{22}0_{11}$ (দ্বি-শর্করা) ঃ সুক্রোজ (sucrose) ও ল্যাকটোজ (lactose)। এইজাতীয় শর্করা খাদ্যও ছাগল হজম করতে পারে।

৩। পলিসেকারাইড (Polysaccharides) (বহু শর্করা) ঃ এগুলো জটিল শর্করা যেমন-

(ক) স্টার্চ (starches) ঃ ঘাস, লতা-পাতা ও গাছে এইগুলো বেশি পাওয়া যায়।

(খ) প্যাকটিন (Pectins)

(গ) সেলুলোজ (Cellulose)

(ঘ) লিগনিন (Lignin)

ক-ঘ পর্যন্ত এইগুলো ঘাস, তৃণলতা পাতা বা গাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। লিগনিনের আঁশ শক্ত এবং সেলুলোজ থেকে কম পরিপাকযোগ্য। ব্যাকটেরিয়া এইজাতীয় শর্করাকে তেমন সহজে ভাঙতে পারে না, ফলে সাধারণত এইগুলো পরিপাকযোগ্য হয় না। ঘাস বা গাছ বা তৃণলতা যতো বেশি বয়স্ক হবে এদের মধ্যে লিগনিনের উপস্থিতি ততো বেশি হবে।

সেলুলোজ (cellulose) ঘাস বা লতা-পাতা বা গাছ বা বীজের বাইরের

আবরণে এইজাতীয় শর্করা পাওয়া যায়। এগুলো ছাগলের জটিল পাকস্থলীতে (compound stomachs) ব্যাকটেরিয়া (bacteria) ও প্রোটোজোয়া (Protozoa) দিয়ে ভেঙে এসিটিক এসিড (Acetic acid), প্রোপিয়নিক এসিড (Propionic acid), বিউটাইরিক এসিড (Butyric acid) এবং মিথেন গ্যাস (Methene gas) ও মাইক্রোবায়োলজিকেল স্টার্চে Microbiological starch রূপান্তরিত হয়। উপরোক্ত তিনটি জৈব এসিড ছাগলের শরীর রক্ষণাবেক্ষণ, শরীরের চর্বি এবং দুধের উপাদান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দুধের চর্বির (ননী) উপস্থিতির পরিমাণ নির্ভর করে পাকস্থলীতে কি পরিমাণ এসিটিক এসিড তৈরি হচ্ছে, তার উপর। যা নির্ভর করছে ছাগলের খাদ্যের উপাদানের উপর (composition of diets/ration)। ছাগলকে ছোবড়াজাতীয় খাদ্য না খাওয়ালে দুধের ননীর হার কমে যায়। ছাগলের খাদ্যের প্রধান অংশই হচ্ছে শর্করা, কিন্তু এইসব শর্করা খাদ্যগ্রহণের পর ছাগলের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব থেকে উচ্চমানের আমিষজাতীয় খাদ্য দুধ ও মাংসে পরিণত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে জমা থাকে চর্বিরূপে। এসব শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করাই শর্করাজাতীয় খাদ্য উপাদানের প্রধান কাজ এবং এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে গ্লুকোজ অক্সিজেনের সাহায্যে দগ্ধ হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি তৈরি করে এবং শক্তির সৃষ্টি করে–

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{O_2} CO_2 + H_2O + \text{শক্তি}$$

তেলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

ইথার (Ether extracts)

তেলজাতীয় খাদ্য উপাদান শরীরের ভিতরে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করতে পারে। শর্করা ও আমিষের মতো এটি পানিতে দ্রবণীয় নয়। উদ্ভিদ যেমন শর্করা হিসেবে শরীরের ভিতর শক্তি জমা রাখে ছাগলও তেমনই চর্বি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে নিজের দেহের জন্য তাপ ও শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। প্রাণিজ চর্বি দেহের অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি স্পর্শকাতর অঙ্গের কুশনের মতো কাজ করে যা বাইরের আঘাত থেকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করতে সক্ষম। দেহের নানাবিধ কোষ গঠনে, পিত্ত (bile), এসিড ও নানা হরমোন গঠনে চর্বি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারণি ২০ ঃ ছাগলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিপাকযোগ্য আমিষের চাহিদার পরিমাণ (গ্রাম/দিন)

জীবন্ত ওজন (কেজি)	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০	৫৫	৬০
পরিপাকযোগ্য আমিষের চাহিদা (গ্রাম)	১০.২	১৩.৯	১৭.২	২০.৩	২৩.৩	২৬.১	২৯.০	৩১.৬	৩৪.২	৩৬.৭	

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

ছাগলের শরীর বৃদ্ধির জন্য শক্তি ও আমিষের চাহিদা

ছাগলের শরীর বৃদ্ধির হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে (সারণি ২২) এবং এর মুখ্য কারণগুলো হচ্ছে—

১। জাতের তারতম্য (Breed differences),

২। পুষ্টির তারতম্য (Nutritional differences) ও

৩। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া।

ছাগল বাচ্চা জন্মের পর যে ওজনের হয় সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই ওজনের সাথে দুধ ছাড়ানোর সময় এবং পরিপূর্ণ বয়সের ওজনের যোগসূত্র রয়েছে। সঠিক বয়সে সঠিক ওজন পাওয়া গেলে সময়মত দুধ ছাড়ানো সম্ভব; যথাসময়ে বয়:প্রাপ্তি হলে ঠিক সময়ে প্রজনন করিয়ে বাচ্চা পাওয়া সম্ভব কিংবা মাংসের জন্য পালিত হলে বিক্রি করে টাকা আয় করা যায়, সঠিক সময়ে সঠিক ওজন হয়ে গেলেই বিক্রি করা লাভজনক। কারণ অনুৎপাদনশীল ছাগল পালন করে লাভবান হওয়া যায় না। ছাগল সাধারণত জন্মের পর প্রথম ৪-৬ মাস দ্রুতগতিতে বাড়ে। একটি স্ত্রী টুগেনবারগ (Toggenburg) জাতের ছাগল ৪.৫ মাস বয়সেই পরিপূর্ণ বয়সের ওজনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সানেন (Saanen) জাতের ছাগল সমপরিমাণ ওজন লাভ করতে সময় লাগে ৮ মাস। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিম্নমানের পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য খাইয়ে একটি ছাগলকে ১৫ কেজি ওজন করতে সময় লাগে ৪৮ সপ্তাহ অথচ একই জাতের একই পরিবেশে উন্নতমানের পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে ১৫ কেজি ওজন করতে সময় লেগেছে মাত্র ২৬ সপ্তাহ।

সারণি ১৯ ঃ বিভিন্ন ব্যবস্থাধীনে পালিত ছাগলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুষ্টি চাহিদার পরিমাণ (প্রতিটি ছাগল/প্রতিদিন)

	আবদ্ধ				অর্ধ-নিবিড়				নিবিড়			
দৈহিক ওজন : Live Weight (kg)	পরিপাক-যোগ্য পুষ্টি TDN (kg)	পরিপাক-যোগ্য শক্তি DE (MJ)	বিপাকীয় কর্মশক্তি ME(MJ)	শর্করা সমতুল্য SE (kg)	পরিপাক-যোগ্য পুষ্টি TDN (kg)	পরিপাক-যোগ্য শক্তি DE (kg)	বিপাকীয় কর্মশক্তি ME(MJ	শর্করা সমতুল্য SE (k g)	পরিপাক-যোগ্য পুষ্টি TDN (kg)	পরিপাক-যোগ্য শক্তি DE (kg)	বিপাকীয় কর্মশক্তি ME(MJ	শর্করা সমতুল্য SE (kg)
১০	০.১৫	২.৮৪	২.৩২	০.১৩	০.১৫	৩.৪১	২.৭৮	০.১৬	০.২১	৪.০	৩.২৫	০.১৮
১৫	০.২১	৩.৮৬	৩.১৫	০.১৮	০.২৫	৪.৩৩	৩.৭৮	০.২২	০.২৯	৫.৪১	৪.৪১	০.২৫
২০	০.২৬	৪.৭৭	৩.৯১	০.২৭	০.৩১	৫.৭২	৪.৬৯	০.২৬	০.৩৬	৬.৬৮	৫.৪৭	০.৩১
২৫	০.৩০	৫.৬৪	৪.৬২	০.২৭	০.৩৬	৬.৭৬	৫.৫৪	০.৩২	০.৪২	৭.৯০	৬.৪৭	০.৩৮
৩০	০.৩৫	৬.৫০	৫.৩০	০.৩১	০.৪২	৭.৮০	৬.৩৬	০.৩৬	০.৪৯	৯.১০	৭.৪২	০.৪২
৩৫	০.৩৯	৭.২৬	৫.৯৫	০.৩৪	০.৪৭	৮.৭১	৭.১৪	০.৪১	০.৫৪	১০.১৬	৮.৩৩	০.৪৮
৪০	০.৪৩	৮.০৩	৬.৯৮	০.৩৮	০.৫২	৯.৬৩	৭.৯০	০.৪৬	০.৬১	১১.২৪	৯.২১	০.৫৩
৪৫	০.৪৭	৮.৭৭	৭.১৯	০.৪১	০.৫৬	১০.৫২	৮.৬৩	০.৪৯	০.৬৪	১২.২৮	১০.০৭	০.৫৭
৫০	০.৫১	৯.৪৯	৭.৭৮	০.৪৫	০.৬১	১১.৩৯	৯.৩৪	০.৫৪	০.৭১	১৩.২৮	১০.৮৯	০.৬৩
৫৫	০.৫৫	১০.১৯	৮.৩৫	০.৪৮	০.৬৬	১২.২৩	১০.০২	০.৫৭	০.৭৭	১৪.২৭	১১.৬৯	০.৬৭
৬০	০.৫৯	১০.৮৮	৮.৯২	০.৫১	০.৭১	১৩.১০	১০.৭০	০.৬১	০.৮৩	১৫.২৩	১২.৪৯	০.৭১

সব পরিপাকযোগ্য পুষ্টি = TDN (Toal Digestible Nutrients)1 Kg TDN = ১৮.৪ MJ DE.
শর্করা সমতুল্য = SE (Starch Equivalent) পরিপাকশক্তি = DE (Digestible Energy)
বিপাকীয় শক্তি = ME (Metabolise Energy) = can be derived by the factor DE x 82%

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

সারণি ২১ ঃ প্রতি কেজি দুধ দেয়ার জন্য পুষ্টির চাহিদার পরিমাণ (Milk replacer)

দুধে ননীর উপস্থিতির হার (%)	শর্করা সমতুল্য SE (গ্রাম)	সব পরিপাক যোগ্য পুষ্টি TDN (গ্রাম)	পরিপাক যোগ্য শক্তি DE MJ	বিপাকীয় কর্মশক্তি ME MJ	পরিপাক যোগ্য আমিষ DP (গ্রাম)	ক্যালশিয়াম (Cal) (গ্রাম)	ফসফরাস (P) (গ্রাম)
৩.৫	২৬২	৩০১	৫.৫২	৪.৫৩	৪৭	০.৮	০.৭
৪.০	২৮০	৩২২	৫.৯৪	৪.৮৭	৫২	০.৯	০.৭
৪.৫	২৯৬	৩৪০	৬.২৮	৫.১৫	৫৯	০.৯	০.৭
৫.০	৩১৪	৩৬২	৬.৬৫	৫.৪৫	৬৬	১.০০	০.৭
৫.৫	৩৩১	৩৮০	৬.৯৯	৫.৭৩	৭৩	১.১	০.৭

এই সারণিতে দানাদার খাদ্য দুধের বিকল্প (milk replacer) হিসেবে বাচ্চা ছাগলকেও খাওয়ানো যেতে পারে।

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

সারণি ২২ ঃ ছাগলের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য শক্তি ও আমিষের চাহিদা (প্রতিটি ছাগল /দিন)

জীবন্ত ওজন	দৈনিক ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ (গ্রাম)	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপাকীয় কর্মশক্তি (ME) MJ MJ	বিপাকীয় কর্মশক্তি অর্জন ME (MJ) প্রায়	মোট বিপাকীয় শক্তি ME	শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ (DM) (গ্রাম)	দেহের ওজনের ২ হিসেবে শুষ্কপদার্থ গ্রহণ	পরিপাক পূর্ণ আমিষের চাহিদা
১০	৫০	২.২২	১.৭৭	৩.৯৯	৪১৪	৪.১	২৩.২
	১০০		৩.৫৩	৫.৭৫	৫৯৭	৬.০	৩৩.৫
	১৫০		৫.৩০	৭.৫২	৭৮১	৭.৮	৪৩.৮
২০	৫০	৩.৭৩	১.৭৭	৫.৫০	৫৭১	২.৯	৩২.০
	১০০		৩.৫৩	৭.২৬	৭৫৫	৩.৮	৪২.৩
	১৫০		৫.৩০	৯.০৩	৯৩৮	৪.৭	৫২.৬
৩০	৫০	৫.০৫	১.৭৭	৬.৮২	৭০৯	২.৪	৩৯.৮
	১০০		৩.৫৩	৮.৫৮	৯৮৩	৩.০	৫০.১
	১৫০		৫.৩০	১০.৩৫	১০৭৬	৩.৬	৬০.৩

জীবন্ত ওজন	দৈনিক ওজন বৃদ্ধির পরিমাণ (গ্রাম)	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপাকীয় কর্মশক্তি (ME) MJ MJ	বিপাকীয় কর্মশক্তি অর্জন ME (MJ) প্রায়	মোট বিপাকীয় শক্তি ME	শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ (DM) (গ্রাম)	দেহের ওজনের ২ হিসেবে শুষ্কপদার্থ গ্রহণ	পরিপাক পূর্ণ আমিষের চাহিদা
৪০	৫০	৬.২৮	১.৭৭	৮.০৫	৮৩৬	২.১	৪৬.৯
	১০০		৩.৫৩	৯.৮১	১০১৯	২.৬	৫৭.২
	২		৫.৩০	১১.৫৮	১২০৩	৩.০	৬৭.৫
৫০	৫০	৭.২৬	১.৭৭	৯.০৩	৯৫৪	১.৯	৫৩.৫
	১০০		৩.৫৩	১০.৭৯	১১৩৮	২.৩	৬৩.৮
	১৫০		৫.৩০	১২.৫৬	১৩২১	২.৬	৭৪.১
৬০	৫০	৮.৫১	১.৭৭	১০.২৮	১০৬৮	১.৮	৫৯.৯
	১০০		৩.৫৩	১২০৪	১২৫১	২.১	৭০.২
	২০০		৫.৩০	১৩.৮১	১৪৩৫	২.৪	৮০.৫

ME = Metabolisable Energy DM = Dry Matter based on an ME concentration of 9.6 MJ per kg DM
DP = Digestible Protein calculated according to IMJDE = 4.8gm DP

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

প্রজননের জন্য শক্তি ও আমিষের চাহিদার পরিমাণ

ভাল প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য ছাগলকে প্রচুর শক্তি (শর্করা) ও আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, কারণ পুষ্টিকর খাদ্যই ছাগলকে সময়মত গর্ভধারণ, গর্ভসংরক্ষণ এবং গর্ভের বাচ্চা ছাগলের দেহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপুষ্টিকর খাদ্য ছাগলে বয়:প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটায়, গর্ভবতী ছাগল দুর্বল বাচ্চা প্রসব করে যা পরবর্তীতে মারা যায় অথবা আশানুরূপ উৎপাদনে সক্ষম হয় না। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সুষম খাদ্য সরবরাহের ফলে যমুনাপারী ও বারবারী যমজ বাচ্চার জন্মের হার বেড়েছে, বছরে দু'বার বাচ্চা দিতে সক্ষম হয়েছে যা কন্ট্রোল দলে (control group) অপুষ্টির খাদ্য সরবরাহ করে পাওয়া যায় নি।

সারণি ২৩ ঃ গর্ভবতী ছাগলের জন্য শক্তি ও আমিষ খাদ্যের চাহিদা (প্রতিটির/প্রতিদিন হিসেবে)

দেহের ওজন (কেজি)	শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ (গ্রাম)	দেহের ওজনের % শুষ্কপদার্থ গ্রহণ (DM)	মোট বিপাকীয় কর্মশক্তি (TME) MJ	পরিপাকিপূর্ণ আমিষ (গ্রাম)
১০	৪৮৪	৪.৮	৫.০৬	২৯.৬
১৫	৬৫৬	৪.৪	৬.৮৬	৪০.০
২০	৮১৬	৪.১	৮.৫৪	৪৯.৮
২৫	৯৫০	৩.৮	১০.০৪	৫৮.৬
৩০	১১০৪	৩.৭	১১.৫৫	৬৭.৪
৩৫	১২৪০	৩.৫	১২.৯৭	৭৫.৬
৪০	১৩৬৮	৩.৪	১৪.৩১	৮৩.৪
৪৫	১৪৯৬	৩.৩	১৫.৬৫	৯১.২
৫০	১৬২০	৩.২	১৬.৯৫	৯৮.৮
৫৫	১৭৩৬	৩.২	১৮.১৬	১০৫.৯
৬০	১৮৫৬	৩.১	১৯.৪১	১১৩.২

* DM -based on ME conc. of ১০.৫ /kg DM MJ,
* DP - Calculated according to IMJ DE = 4.8g DP IMJ = ৪.৪ g DP

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

সারণি ২৪ ঃ একটি ৪০ কেজি দৈহিক ওজনের স্ত্রী ছাগলের শুষ্কপদার্থ (DM), শক্তি ও আমিষের বাৎসরিক চাহিদা

উপাদন	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	গর্ভকালের প্রথম দিকে (Eearly gastation) ১৫ সপ্তাহ	গর্ভকালের শেষ দিকে (Late gastation) ৫ সপ্তাহ	দুগ্ধদান কাল	মোট চাহিদা
শুকনো পদার্থ	০.৬	১.০	১.৪	১.৫	
কেজি/দিন					
কেজি/নির্দিষ্ট সময়	৪২	১০৫	৪৯	২৩১	৪২৭
বিপাকীয় শক্তি (ME)					
MJ প্রতিদিন	৬.২৮	৯.৪৬	১৪.৩১	১৫.৬৯	
MJ নির্দিষ্ট সময়	৪৩৯.৩২	৯৯২.৮৬	৫০০.৮২	২৪১৪.১৭	৪০৪৭.১৭
পরিপাক পূর্ণ আমিষ	৩০.১	৪৫.৪	৬৮.৭	৭৫.৯*	২০.৯
DP গ্রাম /দিন					
কেজি/নির্দিষ্ট সময়	২.১	৪.৮	২.৪	১১.৬	

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

* প্রতিদিন দুই কেজি দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে MJ = ৪.৮ গ্রাম পরিপাকযোগ্য আমিষ

দেহ বৃদ্ধির জন্য বা উৎপাদনের জন্য ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা

ছাগলের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদা সমন্ধে বিস্তারিত তথ্যের অভাব রয়েছে। এই নিয়ে বাংলাদেশে কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তেমন গবেষণা হয়নি। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় ক্যারোটিন (carotene) খাদ্যে থাকলে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব হয় না। ছাগলের ভিটামিন 'এ' ধরে রাখার ক্ষমতা (storage) ভেড়ার থেকে কম। ছাগলকে যদি সকালের রোদে চড়ানো হয় এবং রোদে শুকানো খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহলে ভিটামিন 'সি'-এর অভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছাগলের খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন 'কে' (vitamin K) থাকে। তাই এর অভাব ছাগলে দেখা যায় না। ছাগলের ভিটামিন 'বি'১২ (কবালামিন cobalamin)-এর অভাব হতে পারে যা কোবাল্ট (cobalt) জাতীয় উপাদান খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দিলে এই ভিটামিনের অভাব দূর হয়। ছাগলের বাচ্চার খাদ্যে 'ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (Vitamin B complex) মিশিয়ে দিতে হবে। কারণ বাচ্চা ছাগলের পাকস্থলী এই সময়ে এইগুলো তৈরি করতে পারে না। ছাগলের পাকস্থলী ও অন্ত্রে 'ভিটামিন সি'

(Vitamin C) তৈরি করতে পারে। তাই এটির কোন সমস্যা হয় না। ছাগলের খাদ্যে যাতে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ থাকে খাদ্য তৈরির সময় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দুধ উৎপাদনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

একটি ২০–৪০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী ছাগলের খাদ্য তালিকার নমুনা নিচে দেয়া হলো –

(ক) তাজা ঘাস বা ঘাসের মিশ্রণ	২ – ৩ কেজি/দিন
দানাদার খাদ্য ১৬–১৮% আমিষ	৩০০ গ্রাম – ৮০০ গ্রাম/দিন
(খ) ঘাস বা ঘাসের মিশ্রণ	৭ গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম
দানাদার খাদ্য ১৬–১৮% আমিষ	৩০০ গ্রাম – ৮০০ গ্রাম
(গ) তাজা ঘাস+ লিগ্যুম ঘাস (Lagumes)	১.৮–২.৫ কেজি /দিন
মিশ্রণ দানাদার খাদ্য ১৬–১৮% আমিষ	৩০০ গ্রাম – ৮০০ গ্রাম /দিন
(ঘ) শুষ্ক ঘাস (Dry grass)/	
শুকনো লতাপাতা মিশ্রণ (Hay)	৬০০–৮০০ গ্রাম/দিন
দানাদার খাদ্য ১৬–১৮% আমিষ	৩০০–৮০০ গ্রাম/দিন
সাধারণ নিয়মে প্রতি কেজি দুধের জন্য	৩০০–৫০০ গ্রাম খাদ্য অতিরিক্ত সরবরাহ করতে হবে।

স্ত্রী ছাগলকে গর্ভকালীন ও বাচ্চা দেয়ার পর দানাদার খাদ্য দেয়ার পরিমাণ –

(ক) গর্ভকালীন প্রথম সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম/দিন

(খ) গর্ভকালীন শেষ ২য় সপ্তাহে ২০০–৩০০ গ্রাম/দিন

(গ) বাচ্চা দেয়ার পর প্রথম দু' সপ্তাহ ২০০–৪০০ গ্রাম/দিন

এরপর দেয় দুধের পরিমাণ ও দুধের ননীর উপর ভিত্তি করে ছাগলকে দানাদার খাদ্য দিতে হবে। সারণি ২৫–এ দুগ্ধবতী ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরির একটি নমুনা দেয়া হলো।

দুধ দেয় না এমন গর্ভবতী ছাগলকে খাদ্য দেয়ার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, দুগ্ধদানকালে শরীরের যে ক্ষয় হয়েছে তা পুরণসহ গর্ভের বাচ্চাগুলো যাতে প্রয়োজনমতো পুষ্টি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মাঠে চরে খাবার সুযোগ থাকলে তা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ছোবড়া ও দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে। দানাদার খাদ্য প্রতিদিন ২০০–৭০০ গ্রাম পর্যন্ত খাওয়ানো যেতে পারে।

সারণি ২৫ ঃ দুগ্ধবতী ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরির একটি নমুনা

উপাদান (%)	পূর্ব পরিপাক আমিষ (Crude proteins)		
	১৪%	১৬%	১৮%
ক্যাসাভা (Cassava)	২৫%	১৮%	৮%
ঝোলাগুড় (Molasses)	১৫%	১৫%	১৫%
নারকেলের খৈল	৩৩%	৩৫%	৪০%
বাদামের খৈল	২৫%	৩০%	৩৫%
আয়োডাইজড লবণ (Iodised salt)	১%	১%	১%
খনিজ গুণাগুণ (Mineral mixture)	১%	১%	১%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

সূত্র : উইলিয়াম, ১৯২৮

পাঠা (Breeding buck) যখন প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয় না তখন প্রয়োজনীয় ছোবড়াজাতীয় খাদ্য ছাড়াও প্রতিদিন প্রতিটিকে ৭০০ গ্রাম পর্যন্ত দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো যেতে পারে। পাঠা যখন প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন ৪৫০–৯০০ গ্রাম পর্যন্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে। প্রজনন কাজে ব্যবহারের দু' সপ্তাহ পূর্ব থেকে এই পরিমাণ দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

শিশু বাচ্চা ছাগলের (Baby kids) যত্ন

ছাগলের প্রসবের পর উলানের প্রথম দুধ অর্থাৎ কলোস্ট্রাম (colostrum) অবশ্যই শিশু বাচ্চা ছাগলকে খাওয়াতে হবে। এরপর বিশেষ কারণে দুধ খাওয়ানো সম্ভব না হলে প্রয়োজনীয় বিকল্প (replacer) খাদ্য খাওয়াতে হবে। শিশু বাচ্চা ছাগলকে মায়ের দুধ ছাড়া অন্য দুধ বা দুধজাত খাদ্য খাওয়াতে হলে মনে রাখতে হবে যে—

১। দুধ বা দুধের বিকল্প খাদ্য খাওয়ানের পর দুধের বোতল বাঁট (nipple) বা পাত্রটি অবশ্য ফুটন্ত পানি দিয়ে ধুয়ে রোগ-জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করতে হবে।

২। প্রতিটি শিশু বাচ্চা ছাগলকে প্রতিদিন ৭০০-৯০০ মিলি দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য খাওয়াতে হবে।

৩। উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য দিনে ৩-৫ বারে খাওয়াতে হবে।

৪। ৩-৪ সপ্তাহ বয়স হলে স্টার্টার (starter) খাদ্য দিতে হবে। অন্যান্য ঘাস ও দানাদার খাদ্য পরিমাণ মতো দেয়া যেতে পারে।

৫। তিন চার মাস বয়স হলে দধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছাগলের খাদ্য প্রাপ্তির উৎস

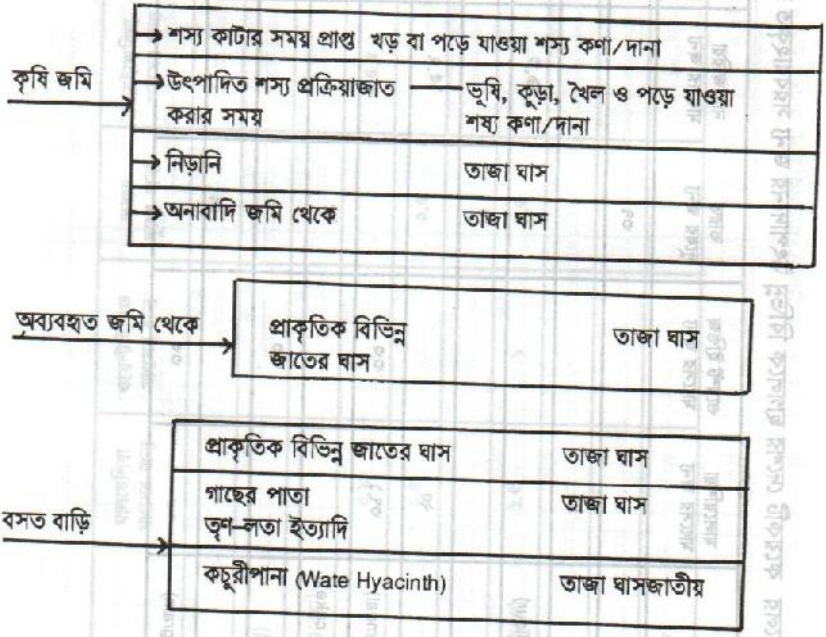

সারণি ২৬ ঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের কয়েকটি দেশের ছাগলকে বিভিন্ন উৎপাদনের জন্য সরবরাহকৃত কয়েকটি খাদ্য উপাদানের পরিমাণ

খাদ্যের উপাদান	মালয়েশিয়া মাংসের জন্য	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাংসের জন্য	ভারত দুধের জন্য	নাইজেরিয়া মাংসের জন্য	টেকসাস পশম/লোমের জন্য	পেরু মাংসের জন্য	মেক্সিকো দুধের জন্য
কর্ণ মিল (Corn meal)			৩৭				৪২
ক্যাসাভা (Cassava)	৪০						
ক্যাসাভার আটা (Cassava flour)				৭৯.৩			
গমের ভূষি (Wheat bran)			২০				
ঝোলাগুড় (Molasses)	২০			১৫.২		১৫	
নারকেলের মিল (Cocunut meal)	৩৭.১	৩৩					
বাদামের খৈল (Groundnut cake)			২৫				
সাইট্রাস মিল (Citrus meal)		৩৩					
শুটকি (Fish meal)							৫
সুরা তৈরির শস্য (Brewer grain)		৩৩					

খাদ্যের উপাদান	মালয়েশিয়া মাংসের জন্য	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাংসের জন্য	ভারত দুধের জন্য	নাইজেরিয়া মাংসের জন্য	টেকসাস পশম/লোমের জন্য	পেরু মাংসের জন্য	মেক্সিকো দুধের জন্য
ছোলা (Gram)			১৫				
তুলার বীজ (Cotton seed)					৬০		৩০
বজরার দানা (Sorghum grain)					৩৮		২০
ইউরিয়া (Urea)	০.৯			৫.৫			
লবণ (Salt)	০.৫		০.৫			০.৫	
ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট					২	১	১
খনিজ মিশ্রণ (Mineral mixture)	১.৫	১	২.৫			১	২
ভুট্টা (maiz)						২৫	
ভুট্টা কব (Maiz cobs)						৩১	
পোল্ট্রি লিটার (Poultry litter)				৮		২৫.৫	

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

উপকরণের নাম	শুষ্ক পদার্থ DM (%)	পরিপাক-যোগ্য আমিষ CP (%)	চর্বি (Fat) (%)	খনিজ (Total Ash) (%)	পরিপাক-যোগ্য ছোবড়া (crude fibre) (%)	চর্বিবিহীন ইথেন (not fat ethen) (%)	বিপাকীয় কর্মশক্তি (ME) মিল/কেজি
রাইস রাফ (Rice rough)	৮৯	৭.৯	১.৭	৪.৭	৮.৯		২.৭৩
তিলের খৈল (Sesam cake)	৮৩.২	৩৫.৬	১৭.২	১১.২	৭.৬	২৭.৮	
সরিষার তেল (Mastard oil cake)	৮৭.২	৩২.১	১০.৪	–	১২.৩	৩২.২	
আলু (শুষ্ক)	৮৯	৭.৪	০.৩	৩	৬.৫		৩.১৬
নদী ছাড়া গুড়া দুধ	৯৪	৩৩.৫	০.৮	৭.৯	০.২		৩.১৩
সয়াবিন (Soyaben)	৯০	৩৭	১৮.৫০	৫	৫		
সয়াবিন খাদ্য (Soyaben meal)	৮৯	৪৪.৬	১.৪	৬.৫	৬.২		২.৯৪
তাল্লো (Tallo)	৯৯	–	৯৯	–	–	–	–
বাদাম তেল	৯৩	৪১.৭৫	৬.৮০	৭.২০	১১.২০		
গম (Wheat)	৮৯	১০.৫০	১.৭	১.৬	২.৩		৩.১৩
গমের ভূষি (Wheat bran)	৮৯	১৫.২	৩.৯	৬.১	১০	৬১.৬	২.৩৭
ভুট্টা (Maiz)	৮৮.৬০	৭.৮০	৩.৬৫	১.২০	৫		

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

সারণি ২৮ ঃ বিভিন্ন শস্য কাটার সময় ও প্রক্রিয়াজাত করার সময় প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্যের হিসাব

শস্য	খড় (Straw) (মণ)	গ্লুম (Glume)	ভূষি	ক্যাসি (Casse)
আউশ ধান	২৫	৬	৫	১
আমন ধান	৩০	৬	৫	১
বোরো ধান	৩০	৭	৩	২
গম	১৮	৩		
মরিচ	১৫			
পাট গাছ	৩৫			
ডাল	২২	৬	৯	
খেশারী	১৬	৬	৯	
কাউন (Kaon)	২৩	–	৯	

সূত্র : হেনস, ১৯৮৬

ছকে দেখানো খাদ্য উপজাতে শতকরা ৮০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ রয়েছে এবং উল্লিখিত মণ প্রতি একরে উৎপাদিত।

মরিচ/গম/গম গাছ খাদ্য হিসেবে ধরা হয় না।

সারণি ২৯ ঃ বিভিন্ন শস্য জমি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাত (ঘাসজাতীয়) বস্তুর হিসাবে (মণ হিসাবে প্রতি একরে)

শস্য	প্রথম বাছাই নিড়ানি	দ্বিতীয় বাছাই নিড়ানি	তৃতীয় বাছাই নিড়ানি	চতুর্থ বাছাই নিড়ানি
আউশ ধান	৭	১৫	১৩	৪
আমন ধান	১২	৩		
বোরো ধান	৮			
গম	৬	৪		
মরিচ	১২	১২	৮	৬
পাট গাছ	৮.৫	১২	৯.৫	১০
ডাল	১৪			
খেশারী	৭.৫	৫		৩
কাউন (Kaon)	১০	১১	৮	৮

সূত্র : হেনস, ১৯৮৬

এসব কাচা ঘাস (নিড়ানি) ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা এগুলো শুকিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক শস্য উৎপাদনকালে প্রতি একর জমিতে উৎপাদিত ঘাসের পরিমাণ হচ্ছে –

(ক) আউশ ধান জমিতে ৩৯ মণ
(খ) আমন ধান জমিতে ১৫ মণ
(গ) বোরো ধান জমিতে ৮ মণ
(ঘ) গম জমিতে ১০ মণ
(ঙ) মরিচ জমিতে ৪২ মণ
(চ) পাট জমিতে ৪০ মণ
(ছ) ডাল জমিতে ১৪ মণ
(জ) খেসারী জমিতে ১৫.৫ মণ
(ঝ) কাউন জমিতে ৩৭.০ মণ।

সূত্র : হেনস, ১৯৮৬

চিত্র ৫১ : মালয়েশিয়ার একটি ছোট খামারে পুরুষ (পাঠা) ছাগলকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর দৃশ্য

চিত্র ৫২ : বাচ্চা ছাগলকে বোতলের সাহায্যে দুধ খাওয়ানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে

সারণি ৩০ ঃ ছাগলের খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের উপস্থিতির পরিমাণ

উপকরণের নাম	শুষ্ক পদার্থ DM (%)	পরিপাক-যোগ্য আমিষ CP(%)	চর্বি (Fat) (%)	খনিজ (Total Ash) (%)	পরিপাক-যোগ্য ছোবড়া crude Fiber	চর্বিবিহীন ইথেন not fat ethen মিল/কেজি	বিপাকীয় শক্তি (ME)
মাইলো ভূষি (Millo bran)	৮৮	৮.৯	৫.৫		৮.৬	৭৪.৬	
মসুরির ডাল	৮৭.৬	২৬.৪	১.১	২.১	৮.৪	৬১.৩	
খেসারীর ডাল	৯০	২৮.২	০.৬			৫৬.৬	৩.৫
তুলাবীজ (Cotton Seed)	৯২.২	২৮.২		০.২	১৪.৬		
শুটকি (Dry fish)	৯২	৬০-৬৫	৯.৬	১৯	০.৯		২.৫৭
তিষি খাদ্য (Lin seed Meal)	৯০	৩৪.৬	১.৬	৫.৮	৯.১		২.৭৩
ঝিনুক (Oyster shell)	৯৯			Cal ৩৮ pH ০৭			
খড় (straw)	৮১	৩.৯	২.১	১৭.৭	৩৫.৫	৩৯.১	
তুষ (Rice straw)	৮৭	৪.৩	০.৮		৩০	৫০.৯	
আলফাআলফা (Alfaalfa)	৯০	১৫.৩	২.৩		২৩.৪		১.৯২
গিনি ঘাস	১৯.৪	১২.২	৩.৪	১৪.৩	৩০.৯	৩৯.২	
ক্যাসাভা মূল	৩৭.১	৩.৫	০.৯	৩	৪.৩	৮৮.৩	

উপকরণের নাম	শুষ্ক-পদার্থ DM (%)	পরিপাক যোগ্য আমিষ CP(%)	চর্বি (Fat) (%)	খনিজ Total Ash(%)	পরিপাক যোগ্য ছোবড়া crude Fiber	চর্বিবিহীন ইথেন not fat ethen মিল/কেজি	বিপাকীয় শক্তি (ME)
স্টার খড় (Hay)	৮৭.৪	১৩.২	৫.৩	১০.২	৩২	৩৯.২	
কুচরিপানা (Water hyacinth)	৫.৯	১৩.১	১.৩		১৮.২	৫২.২	
বাঁশ পাতা (Bamboo leaves)	২৭.৪	২০.৫	৭.৫		২৬	৩১.২	
প্যারা (Grass brachiaria)	২৬.৭	১০.১	৩		২৬.৬	৪৬.৮	
Imperala cylindrica		৬.৬	৩.৩		৩৪.৬	৪৭.৩	
Paspalua conjugates	২১.৩	১৩.৬	১.৯		২৬.৩	৪৪.৬	
Cow pea hay	৯০	১৭.৫	২.৮	১০.২	২৪		
গমের গাছের খড় (Wheat straw)	৮৯	৩.২	১.৬	৬.৯	৩৭		১.৩৪
কলমীশাক	১২.৪০	১.৭৮	০.৯২	১.০৫		৪.১৬	
পুঁই শাক	৮	২.২৩	০.৯৫	১.৪০		৯.৪৪	
পাট শাক	৭	২.৫৬	০.১১	১.২৬		৪.২২	
লাল শাক	৮	৫.৩৪	০.১৪	২.৪		৯.৭	

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

ছাগলের উপজাত দ্রব্য বেচা-কেনা

সারণি ৩১ ঃ বাংলাদেশে ছাগল বেচা কেনার পদ্ধতি

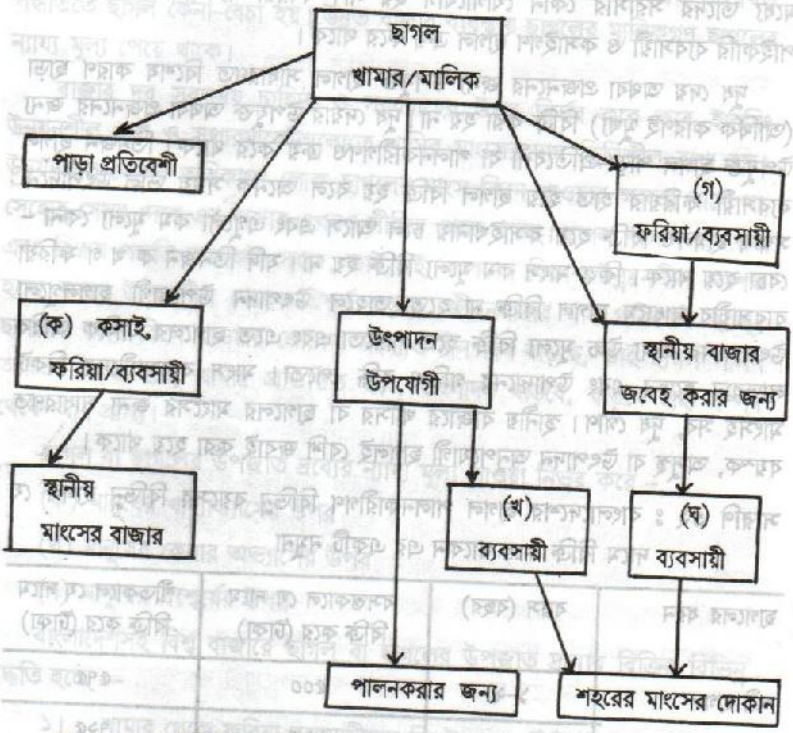

ক, খ, গ এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ একই ব্যক্তি হতে পারে অথবা ভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে কিন্তু ঘ তে বর্ণিত ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি নন, এরা পাইকারী ক্রেতা-বিক্রেতা। সাধারণত এরা সরাসরি ছাগল খামার মালিকের সংস্পর্শে আসেন না।

ছাগল বেচাকেনার কারণ

ছাগল বেচা-কেনা নির্ভর করে—

(ক) ছাগলের বয়স

(খ) ছাগলের উৎপাদন ক্ষমতা

(গ) ছাগলের লিঙ্গ : সাধারণত পুরুষ ছাগল নির্দিষ্ট বয়সে খাসি করে মাংসের জন্য বিক্রি করা হয়ে থাকে।

পারিবারিক উৎসবে ছাগল ক্রয় করা হয়ে থাকে যেমন বিয়ে, খতনা, কুলখানি ও চেহলাম এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। সারণি ৩১ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, শহরই গ্রামবাংলায় পালিত ছাগল বা খাসির প্রধান ক্রেতা ও ভোক্তা। কিন্তু ছাগল মালিকদের মধ্যে তাদের সরাসরি কোন যোগাযোগ হয় না। ফরিয়া ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই পাইকারি ব্যবসায়ী ও কসাইগণ ছাগল ক্রয় করে থাকে।

দুধ দেয় অথবা প্রজননের জন্য উপযুক্ত ছাগল সাধারণত বিশেষ কারণ ছাড়া (আর্থিক কারণই মুখ্য) বিক্রি করা হয় না। দুধ দেয়ার উপযুক্ত অথবা প্রজননের জন্য উপযুক্ত ছাগল পাড়া-প্রতিবেশী বা পালনকারীগণও ক্রয় করে থাকে। তিনজন ছাগল ব্যবসায়ী ফরিয়ার হাত হয়ে ছাগল বিক্রি হয় বলে অনেক সময় ভাল উৎপাদনে সক্ষম ছাগলও বিক্রি হয়ে কসাইখানায় চলে আসে এবং এগুলো কম মূল্যে কেনা – বেচা হয়ে থাকে। কিন্তু মাংস কম মূল্যে বিক্রি হয় না। যদি তিনজন ক খ গ ফরিয়া ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ছাগল বিক্রি না হতো তাহলে উৎপাদন উপযোগী ছাগলগুলো উৎপাদনের জন্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি হতে পারতো এবং এতে ছাগলের মালিক অধিক লাভবান হতেন এবং উপাদানের গতিও বৃদ্ধি পেতো। মাংস ব্যবসায়ীদের নিকট মাংসই সব, দুধ গৌণ। স্থানীয় বাজারে খাসির বা ছাগলের মাংসের জন্য সাধারণত বয়স্ক, অসুস্থ বা উৎপাদন অনুপযোগী ছাগলই বেশি জবাই করা হয়ে থাকে।

সারণি ৩২ ঃ বাংলাদেশের ছাগল পালনকারীগণ বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ছাগল যে দামে বিক্রি করে থাকেন এর একটি নমুনা

ছাগলের ধরন	বয়স (বছর)	বসন্তকালে যে দামে বিক্রি করে (টাকা)	শীতকালে যে দামে বিক্রি করে (টাকা)
স্ত্রী ছাগল	১–২	৫০০	৫৭৫
	২	৬৮৫	৭২৫
খাসি ছাগল	১–২	৭২৫	৭৫০
	২	৮০০	৯০০
ছাগল দু' বাচ্চাসহ		৭২৫	৭৫০

সূত্র : হেনস, ৮৬

এখানে উল্লেখ্য যে, ছাগলের দরের উঠা নামার হার শতকরা ২০ ভাগ কমবেশি হতে পারে।

বাজারে যেসব ছাগল বিক্রি হয় এর অধিকাংশই শহরে বা গ্রাম্য বাজারে জবাই হয়ে থাকে। খুব অল্পসংখ্যকই মালিক থেকে পালনকারীরা কিনে থাকেন। কসাই বা মাংস ব্যবসায়ীরা দুধ দেয় এমন ছাগলের ক্রেতা নয়। বাচ্চা ছাগল, দুধ ছাড়ানো ছাগল কসাই বা ব্যবসায়ীরা সচ্ছন্দে কিনে থাকে। বাড়িতে ছাগল কমই বেচা-কেনা হয়, কারণ এখানে দর যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই, তাই বাজার বা হাটেই ছাগল বেশি কেনা-বেচা হয়। বাংলাদেশসহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে সারণিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ছাগল কেনা-বেচা হয়। উন্নত বাজার ব্যবস্থায় ছাগলের মালিকগণ ছাগলের ন্যায্য মূল্য পেয়ে থাকে।

বাজার দর সবসময় চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে তবে ইদানিং উন্নয়নশীল দেশ ও সুপারমার্কেটগুলোতে খাসির মাংসের দাম স্থিতিশীল রাখা হয়। উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ লোক ছাগলের মাংস কিনে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে না, সেহেতু সেসব দেশে এর বাজার এখনও সীমিত থেকে যাচ্ছে। ছাগল পালনে ব্যয় কম এবং বিক্রয় পদ্ধতি অনেকটা সহজ, তাই এই সম্পদের বিকাশ উন্নয়নশীল দেশেও হচ্ছে কারণ উন্নয়নশীল দেশেও ঐশ্বর্য বাড়ছে, জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হচ্ছে। ছাগলের মাংস কিনে খাওয়ার লোকের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে, তাই ছাগল পালন আরও বিস্তৃত হবে, খামার প্রতিষ্ঠিত হবে, উৎপাদন বাড়বে, বাড়বে এই সম্পদ থেকে আয় প্রাপ্তি।

ছাগল বা ছাগলের উপজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া নির্ভর করে –

(ক) মানুষের খাদ্যাভ্যাসের উপর

(খ) মানুষের কেনার অভ্যাসের উপর

(গ) মানুষের ঐশ্বের্যের উপর

বাংলাদেশসহ বিশ্ব বাজারে ছাগল বা ছাগলের উপজাত দ্রব্যের বিক্রির বিভিন্ন পদ্ধতি হচ্ছে —

১। খামার থেকে ফরিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট ছাগল বিক্রি করা।

২। স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা।

৩। গ্রাম বা খামার থেকে এনে শহরে পাইকারদের নিকট বিক্রি করা।

৪। সরকারি কসাইখানায় (Slaughter House) বিক্রি করা।

৫। মাংস খামারে বিক্রি করা।

৬। মাংস ও মাংস উপজাত দ্রব্য কসাইদের দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করা।

৭। মাংস ও মাংস উপজাত খাদ্যোপযোগী দ্রব্য রান্না করে মানুষের খাদ্য বা পশু খাদ্য হিসেবে বাজারে কিংবা শহরে বিক্রি করা।

উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত ফরিয়া ব্যবসায়ীর নিকট ছাগল বিক্রি করা হয়ে থাকে। এইসব ফরিয়া ব্যবসায়ীগণ খামার থেকে খামারে, গ্রাম থেকে গ্রামে ছাগল কেনার জন্য ঘুরে বেড়ান এবং অতি স্বল্প দর-কষাকষির মাধ্যমেই ছাগল কিনে থাকেন। এরা মালিকদের সাথে অনেকটা পরিচিত। আনুমানিক ছাগলের ওজনের উপরই মূল্য ঠিক হয়ে থাকে ফলে ছাগল মালিকগণ আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। ইদানিং ছাগল ওজন করে বিক্রি করার পদ্ধতি অনেক দেশে চালু হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ মালয়েশিয়া। এর ফলে মালিকদেরকে ঠকানো কমে যাচ্ছে। ফরিয়া ব্যবসায়ীগণ গ্রাম থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেগুলো শহরের পাইকার অথবা কসাইদের নিকট বিক্রি করে থাকে। ফরিয়া ব্যবসায়ীগণ তুলনামূলকভাবে বেশি লাভ করে থাকে। এই পদ্ধতি এশিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রচলিত আছে।

ছাগলের মালিকগণ সরাসরি বাজারে নিয়ে ছাগল বিক্রি করার পদ্ধতি এশিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ ও আফ্রিকায় প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে ছাগলের মালিকগণ তুলনামূলকভাবে বেশি দামে ছাগল বিক্রি করে অধিক লাভবান হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতিতে মালিক ছাগল বাজারে নিয়ে গিয়ে ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, বিক্রি না হলে ফিরিয়ে আনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সরকারি কসাইখানার ছাগল জবেহ করার আধুনিক কলাকৌশল অনুসরণ করে ছাগল জবাই করার পদ্ধতি অনেক দেশে চালু হয়েছে বা হচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, এই সব উপলব্ধি থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে ছাগল জবাই করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে। কসাইখানা এমনভাবে স্থাপন করা হচ্ছে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল জবাই করে, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যোপযোগী বস্তুগুলো সংগ্রহ করা যায় এবং অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য উপাদানগুলো (রক্ত বা চামড়া) সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ করা যায়। এই পদ্ধতিতে মাংস ও অন্যান্য খাদ্যোপযোগী বস্তুগুলো রোগ-জীবাণু দিয়ে কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

অনেক সময় খামার বা ছাগল মালিকগণ গ্রামে বা খামারে ছাগল জবাই করে মাংস বিক্রি করে থাকে। খামারের পাশেই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছাগল জবাই করা

হয় এবং পরে পাড়া-প্রতিবেশী বা স্থানীয় কসাইদের নিকট মাংস বিক্রি করা হয়ে থাকে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হালাল মাংসের জন্য এই জাতীয় জবাই উৎসাহিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে ছাগলের মালিক ছাগলের মূল্য পেয়ে থাকে, এখানে ফরিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাত থাকে না। তবে এই পদ্ধতিতে মানুষের মধ্যে ছাগলের রোগসমূহ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে; যেমন ফিতাক্রিমি। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে এই পদ্ধতিতে জবাই করার প্রচলন রয়েছে।

বিভিন্নভাবে ছাগল বাজারে আনা নেয়া করা যেতে পারে।

১। সড়ক পথ
২। রেল পথ
৩। নৌপথ
৪। আকাশ পথ

খামারে লালন-পালন করা ছাগল বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাবার পদ্ধতিগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সড়ক পথে ছাগল পরিবহন

এটি খুব প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত আদি পন্থা। ছাগলের খামার থেকে বাজার ৭-৮ কিলোমিটার দূরে হয় তাহলে ছাগল সড়ক পথে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ আনা-নেয়া করা যায়। এর বেশি দূরত্ব হলে রিকশা, ভ্যান, রিকশা গাড়ি, মোটর গাড়ি বা বাস ছাগল আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়। দূরত্ব যদি ৬০ কিলোমিটারের বেশি হয় তাহলে এইসব যানবাহনে ছাগল আনা নেয়া করা যায় না। ট্রাকযোগে ছাগল আনা নেয়া করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে ছাগল যাতে বৃষ্টির পানিতে না ভিজে কিংবা অতিরিক্ত রোদে না পুড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যানবাহনটিতে ছাগল বেঁধে রাখতে হবে লক্ষ্য রাখতে ছাগলের সংখ্যা বেশি (গাদাগাদি) হয়ে যায়। প্রতিটি ছাগলের জন্য ০.২০—০.২৫ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

রেলপথে ছাগল পরিবহন

বেশি দূর থেকে ছাগল পরিবহন করতে হলে রেলপথই নিরাপদ। গাড়িতে ছাগল বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

নৌপথে স্টিমার, লঞ্চ, নৌকায় ছাগল একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহন করা যায়। যেইসব এলাকায় সড়ক বা রেলপথ নেই সেইসব এলাকায় লঞ্চ, স্টিমার, বড় বড় নৌকায় ছাগল পরিবহন করা হয়। ছাগল যাতে পানিতে বেশি না ভিজে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছাগল পরিবহনের সময় প্রয়োজনানুসারে সবসময়ই ছাগলকে তদারকি করতে হয়।

আকাশপথে উড়োজাহাজে ছাগল পরিবহন করা যায়। এক দেশ থেকে দূরের অন্য আরেক দেশে ছাগল তাড়াতাড়ি পাঠানোর জন্য উড়োজাহাজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক, অল্পদিনের গর্ভবতী, গর্ভবতী নয় এমন ছাগলই এই পথে পরিবহন করার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

ছাগল থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য

ছাগল থেকে নানা প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে –

১। মাংস (Meat)

২। দুধ (Milk)

৩। চামড়া (Skin)

৪। লোম (পশম) (Hair Pashmina)

৫। গোবর বা চনা (Faces and Urine)

৬। রক্ত (Blood), হাড় (Bones) ও নাড়িভুড়ি (Viscera)

শুধু ছাগল পালন করাই লাভজনক নয়। ছাগল থেকে উৎপাদিত বা প্রাপ্ত বস্তুর যথাযথ ব্যবহার ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমেই অর্থ উপার্জিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই সম্পদের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের কোন সরকারি নীতি নেই। ফলে পালনকারী কিংবা গ্রহীতা বা ভোক্তা থেকে বেশি লাভবান হচ্ছে মধ্য সত্বভোগী যাদেরকে দালাল বা ফরিয়া ব্যবসায়ী বলা হয়। তাই পালনকারী ও ব্যবহারকারীদের স্বার্থে ছাগল থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু বাজারজাত করার একটি সরকারি নীতি ঘোষণা করা উচিত।

মাংস

ছাগলের মাংস বাংলাদেশে খাসির মাংস (Meat of castrated goats) নামেই বেশি বিক্রি হয়।

ক. ছাগলের মাংস এদেশে খুবই জনপ্রিয় ও পছন্দনীয়।

খ. ছাগলের মাংস সুস্বাদু।

গ. ছাগলের মাংস দেখতে অনেকটা কালচে বা ঘোর লাল (dark red) এবং চর্বি পাতলাভাবে থাকে। চর্বি সাদা থেকে হলুদ বর্ণের হতে পারে। চর্বির

অধিকাংশই নাড়িভূড়িতে জমা থাকে। তাই পৃথকভাবে সংগ্রহ করা সহজ।

ঘ. পাঠা ছাগলের মাংসে অনেক সময় চারিত্রিক বৈশিষ্টপূর্ণ (characteristic odour) গন্ধ থাকতে পারে তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ঙ. গ্রীষ্মমণ্ডলের উন্নয়নশীল দেশে ছাগল জবাই করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায় কারণ চাহিদা অনুসারে জবাই করা হয় ফলে সংরক্ষণের তেমন ব্যবস্থা থাকে না। বাংলাদেশের সুপার মার্কেটগুলোতে মাংস সংরক্ষণ করার কিছু ব্যবস্থা বর্তমানে চালু হয়েছে, যা মাংসের গুণাগুণ রক্ষায় খুবই সহায়ক, বাংলাদেশের কসাইখানা বা খুবই সেকেলে ধরনের এবং অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই, অথচ বৈজ্ঞানিক কসাইখানা থাকলে ছাগলের শরীরের ওজনের শতকরা ৭০-৮২ ভাগ বস্তু বিক্রয়যোগ্য এবং মানুষের উপকারে আসে অথচ অবৈজ্ঞানিক কসাইখানায় যত্রতত্র ছাগল জবাই করার ফলে এ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য সুষ্ঠু সংগ্রহ এবং ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না; ফলে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। ছাগল থেকে প্রাপ্ত রক্ত বা নাড়িভূড়ি বা হাড় ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে গৃহপালিত হাঁস - মুরগি বা কুকুর, বিড়াল বা গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। ফলে সনাতন উৎস থেকে প্রাপ্ত আমিষের উপর চাপ কমে, যাতে মানুষের জন্য আমিষ প্রাপ্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে। তাছাড়া গৃহপালিত খামারে পালিত হাঁস-মুরগিকে এই অব্যবহৃত আমিষ খাইয়ে অধিক পরিমাণে উন্নতমানের আমিষ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

ছাগলের দুধ

ছাগলের দুধ সহজে হজম হয়। ছাগলের দুধের চর্বির দানা (fat globules) ছোট ও সহজপাচ্য, তাই রোগীদের জন্য পথ্য ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ছাগলের দুধে এন্টিএলার্জিক পদার্থ থাকে না এবং গরুর দুধে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা বেশি অথচ ছাগলের দুধে এই রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা নেই বিধায় বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে ছাগলের দুধের চাহিদা বেশি। ছাগলের দুধে শক্ত পদার্থের (solid) পরিমাণ গরুর দুধ থেকে বেশি। এইজন্য এই দুধ দিয়ে দধি, পনির ইত্যাদি তৈরি করা অধিক লাভজনক।

ছাগল, গাভি, মহিষ ও মানুষের দুধে বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতির পরিমাণ সারণি ৩৩-এ উপস্থাপন করা হলো -

সারণি ৩৩ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর দুধের বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতির পরিমাণ

প্রজাতি ও তাদের উৎসস্থান	চর্বি (Fat %)	আমিষ (Protien%)	দুগ্ধ শর্করা (Lactose%)	আঁশ (Ash %)	চর্বি ছাড়া শক্ত পদার্থ (S. N.F. %)	মোট শক্ত পদার্থ (Total solid%)
ছাগলের দুধ	৪.৯	৪.৩	৫.০	০.৮৯	৯.৩	১৪.২
মাতৃ দুগ্ধ	৪.০	১.৫	৬.৮	০.২১		
বাংলাদেশের গাভীর দুধ	৪.৮	২.৮	৪.৬	০.৭৪	৮.১	১৩.৫
ইউরোপীয় গাভীর দুধ	৩.৭	৩.৪	৪.৮	০.৭৩	৮.৯	১২.৭
ভারতের মহিষের দুধ	৬.৮	৩.৯	৪.৮	–	৯.৬	

সূত্র : উইলিয়ামস, ১৯৭৮

খাদ্যের গুণাগুণের উপর দুধের গুণাগুণ নির্ভরশীল। উপরোক্ত সারণিতে উপস্থাপিত দুধে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের সুষম খাদ্য খাওয়ানো এই প্রজাতির (species) বলে ধরে নেয়া হয়েছে। ছাগলের দুধে ভিটামিন 'এ' সরাসরি উপস্থিত রয়েছে প্রিকারসর হিসেবে নয়। ছাগলের দুধে যেসব ভিটামিন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ভিটামিন 'এ', নিকোটিনিক এসিড, কোলিন, ইনসিটল, কম পরিমাণে রয়েছে বি৬, সি,। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য হলেও গো-মহিষের দুধে ভিটামিন সি-এর অভাব থাকায় একে মানুষের জন্য একটি সম্পূর্ণ খাদ্য বলা যায় না। ছাগল, গরু, মহিষের বাছুর বা বাচ্চা তাদের দেহের অভ্যন্তরে প্রয়োজনমাফিক ভিটামিন 'সি' তৈরি করতে পারে যা মানব শিশু পারে না। তাই ছয় মাস সময়ের বেশি সময় ধরে এইসব প্রাণীর দুধ মানব শিশুকে খাওয়ালে লোহার (Iron) অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে রক্তাল্পতায় (Anaemia) ভুগতে পারে। ছাগলের দুধ আয়রন (Fe) কপার (Cu), সোডিয়াম (Na) জাতীয় খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ছাগলের দুধ এমাইনো এসিড (Amino Asids) প্রাপ্তির একটি বিশ্বস্থ উৎস। ছাগলের দুধে রয়েছে হিস্টিডিন (Histidine) এসপারটিক এসিড (Aspartic acid) ও টাইরোসিন (Tyrosine)।

সারণি ৩৪ ঃ ছাগলের দুধে ননীর দানার আকার (fat globules size) এবং দুধে এর বিতরণের হার ।

ননীদানার ব্যাস Diameter of Fat globules (mu) মাইক্রোমিটার	প্রজাতির নাম			
	ছাগল (%)	গাভি (%)	মহিষ (%)	ভেড়া (%)
১.৫	২৮.৪	১০.৭	৭.৯	২৮.৭
৩.০	৩৪.৭	৩২.৬	১৩.৬	৩৯.৭
৪.৫	১৯.৭	২২.১	১৬.৪	১৭.৩
৬.০	১১.৭	১৭.৯	২০.৩	১২.১
৭.৫	৪.৪	১২.২	২০.৯	২.০
৯	১.০	৩.১	১০.৫	০.২
১০.৫	০.২	১.৪	১.৭	০
১২	–	০.১	২.০	০.১
১৩.৫	–	–	০.৪	–
১৫.৫	–	–	০.৩	–
১৬.৫	–	–	–	–
১৮.৫	–	–	০.১	–
গড়ে	৩.৪৯	৪.৫৫	৫.৯২	৩.৩০

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

সারণি ৩৫ঃ ছাগল, গরু ও মহিষের দুধে বিভিন্ন ভিটামিনের উপস্থিতির পরিমাণ

ভিটামিনের নাম	ছাগলের দুধে	মহিষের দুধে	গাভির দুধে
	মিলিগ্রাম/লিটার	মিলিগ্রাম/লিটার	মিলিগ্রাম/লিটার
ভিটামিন এ (Vitamin A)	২০৭৪	১৬৬৯	১৫৬০
ভিটামিন ডি (Vitamin D)	২৩৭	–	–
থায়ামিন (Vitamin B_1)	০.৪০	০.৫০	০.৪৪
রিবোফ্লেভিন (Riboflavin B_2)	১.৮৪	১.০৭	১.৭৫
নিকোটেনিক এসিড (Nicotenic acid)	১.৮৭	১.৭১	০.৯৪
ভিটামিন বি৬ (Vitamin B_6)	০.০৭	০.২৫	০.৬৪
প্যানটোথেনিক এসিড (pantothenic acid)	৩.৪৪	১.৫০	৩.৪৬
বায়োটিন (Biotin)	০.০৩৯	০.১৩	০.০৩১
ফলিক এসিড (Folic acid)	০.০০২৪	০.৫১	০.০০২৮
এসকরবিক এসিড (Ascerbic Acid)	১৫.০	২৫.৪	২১.১
কোলিন (Choline)	১৫০	–	১২১
ইনসিটল (Inositol)	২১০	–	১১০

সূত্র ঃ দেবেন্দ্র , ১৯৮৬

সারণি ৩৬ ঃ ছাগল, মহিষ ও গাভির ননীর (Fats) ফ্যাটি এসিডের গঠন শতকরা ওজনভিত্তিক
(percentage by weight.)

প্রজাতির নাম	C4-0	C6-0	C10-0	C12-0	C14-0	C16-0	C16-1	C18-0	C18-1	C18-2	C8-0
ছাগল	২.৬	২.৯	৮.৪	৩.৩	১০.৩	২৪.৬	২.২	১২.৫	২৮.৫	২.২	২.৭
মহিষ	৩.৯	১.৬	১.৬	২.১	১০.৮	৩৩.০	–	১১.০	২৪.৫	–	০.৪
গাভী	৩.৩	১.৬	৩.০	৩.১	৯.৫	২৬.৫	২.৩	১৪.৬	২৯.৮	–	১.৩

সূত্র ঃ দেবেন্দ্র , ১৯৮৬

সারণি ৩৭ ঃ ছাগল, গাভি ও মহিষের দুধের কেজিনে (caseins) এমাইনো এসিডের উপস্থিতির পরিমাণ

প্রতি ১০০ গ্রাম কেজিনে এমাইনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম)	ছাগলের দুধ	মহিষের দুধ	গাভীর দুধ
এলানিন (Alanine)	৩.৬	২.৪	৩.৪
আরজিনিন (Arginine)	২.১	২.৮	৪.১
এসপারটিক এসিড (Aspartic Acid)	২৭.৩	৭.৪	৭.৪
সিস্টিন/সিস্টাইন (Cystine/Cysteine)	০.৪	–	০.৪
গ্লাইসিন (Glycine)	২.১	৮.৬	২.১
গ্লুটামিক এসিড (Glutamic Acid)	২০.৩	–	২৩.২
হিস্টিডিন (Histidine)	৫.০	১.৬	৩.২
আইসোলিউসিন (Isoleucine)	৪.৩	১৩.৩	৬.৬
লিউসিন (Leucine)	৯.১	–	১০.০
লাইসিন (Lysine)	৩.৫	৭.৬	৮.১
মিথিওনিন (Methionine)	৬..০	২.০	৩.২
ফিনাইল এলানিন (Phenylalanine)	১৪.৬	৪.৫	৫.৪
প্রোলিন (Proline)	–	–	১১.৮
সেরিন (Serine)	৫.২	–	৬.৬
থ্রিওনিন (Threnine)	৫.৭	৩.৭	৪.৩
টাইরোসিন (Tyrosine)	৪.৮	৪.২	৫.৮
ট্রিপটোফেন (Tryptophan)	১.৩	১.৫	১.৩
ভেলিন (Valine)	৫.৭	৫.৬	৭.৫

সূত্র : দেকেস্ত্র, ১৯৮৬

চামড়া

ছাগলের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন শিল্প যাতে হাজার হাজার লোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশের স্থানীয় ছাগলের চামড়ার চাহিদা বিশ্বজুড়ে এবং তা রপ্তানি করে বাংলাদেশ বছরে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে সক্ষম। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মতোই নাইজেরিয়ার রেড সোকোটো ছাগলের চামড়া মূল্যবান। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে একটি ছাগলের চামড়ার মূল্য প্রাণীটির মূল্যের ৫-১০%। তাই চামড়া ছাড়ানোর সময় যত্নবান হতে হবে যাতে চামড়া কেটে গিয়ে এর মূল্য কমে না যায়।

তাছাড়া ছাগল পালনে মালিকদের উদাসীনতার জন্য মূল্যবান চামড়ার পুরো মূল্য মালিকগণ পায় না, কারণ —

যেসব কারণে ছাগলের চামড়া নষ্ট হতে পারে যথা

১। চামড়ার ছিদ্র থাকলে, গভীরভাবে চামড়ায় নাম্বার দেয়া হলে

২। লোহার তার, ধারালো হাড়, কাঁটা, এই সব দিয়ে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হলে

৩। অনেক আঁঠালী চামড়াতে ছোট ছোট ছিদ্র করে থাকে যা পাকা করার পর বেশ বড় আকারের হয়ে চামড়ার বাজার মূল্য অনেক কমিয়ে দেয়।

৪। জবাই করার পূর্বে ছাগলটিকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এইজন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করতে হবে। যথা —

(ক) ছাগলটিকে অন্যান্য ছাগল থেকে আলাদা করতে হবে এবং পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

(খ) ছাগলটিকে ১২ ঘন্টা পূর্ব থেকে খাবার বন্ধ করে দিতে হবে তবে পানি পান করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(গ) ছাগল সকাল বেলায় জবাই করা ভাল।

(ঘ) সিমেন্টের মেঝেতে ছাগল জবাই করা উচিত। নতুবা এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন জবাই করার সময় রক্ত বাইরের দিকে চলে যেতে

৫। জবাই করার এবং চামড়া ছাড়ানোর সময় চামড়ার যেসব ক্ষতি হতে পারে

(ক) জবাই করার স্থানে ধারালো বস্তু থাকলে ছাগলের চামড়া কেটে যেতে পারে।

(খ) তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে রক্ত বের হতে না দিলে, চামড়া তাড়াতাড়ি পচতে আরম্ভ করে।

(গ) চামড়া ছাড়ানোর সময় সাবধান না হলে চামড়া কেটে যেতে পারে। বিশেষ করে তীক্ষ্ম সুঁচালো ছুড়ি ব্যবহার করা হলে চামড়া ছোট তুচ্ছ ছিদ্রটি পাকা করার পর বড় আকারের হয়ে যায়।

(ঘ) চামড়া ছাড়ানোর পর কয়েক ঘন্টা ভাঁজ করে রাখা হলে চামড়ার পশম পড়ে যায়, যার ফলে চামড়ার গুণগত মান কমে যায়, চামড়াতে পচন ধরে।

৬। পচন থেকে চামড়াকে রক্ষা করার জন্য করণীয় হচ্ছে —

১. চামড়া ছাড়ানোর পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে চামড়ার কারখানায় পৌছে দিতে পারলে কোনপ্রকার প্রক্রিয়াজাত পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই নতুবা প্রক্রিয়াজাত করে নিতে হবে। তা না করা হলে চামড়া পচে নষ্ট হয়ে যাবে। চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

২. ভিজা কাঁচা চামড়া ভাজ করে রাখা উচিত নয়। একটির উপর আরেকটি স্তুপ করে রাখতে হবে।

৩. চামড়া শুকানোর সময় চামড়ার মাংসযুক্ত দিকটির সাথে অন্য কোন বস্তু যাতে লেগে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. শুকানো চামড়ার ক্ষতি না হয় সেইভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. মাটিতে বিছিয়ে চামড়া শুকালে তাড়াতাড়ি পচন ধরতে পারে কারণ মাটিতে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে যা পচন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে।

৬. মাটিতে শুকানো চামড়ার বাইরের দিকে শুকনো মনে হলেও ভিতরে ভিজা থাকতে পারে। অথবা বেশি শুকিয়ে শক্ত বোর্ডের মতো হয়ে যেতে পারে। শুকানোর তারতম্যের জন্য স্তর সৃষ্টি হতে পারে।

৭. অতিরিক্ত তাপের জন্য চামড়ার উপরে অবস্থিত চর্বি গলে গিয়ে চামড়ার মধ্যে চলে আসতে পারে, যা চামড়ার জন্য ক্ষতিকর।

বৃষ্টি চামড়াতে কাদা মিশ্রিত করতে পারে যা চামড়াকে অমসৃণ করে তুলতে পারে। তাই চামড়া শুকানোর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ঝুলিয়ে শুকানো।

৭। ঝুলিয়ে চামড়া শুকানোর সময় করণীয়—

(ক) চামড়া খুব কষে টেনে ঝোলানো যাবে না, কারণ তাতে চামড়া পাতলা হয়ে যেতে পারে।

(খ) কেঁচো পোকা, বন্য জন্তু যেন চামড়া ছিড়তে বা খেয়ে ফেলতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(গ) শুকানোর পর ইঁদুর, গোবরে পোকা (beetles) কোন কোন প্রজাতির পিপড়া, ইঁদুর চামড়া নষ্ট করে ফেলতে পারে। বিড়াল কিংবা ফাঁদ পেতে ইঁদুর অথবা ওষুধ ব্যবহার করে এদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে।

(ঘ) পাকা মেঝে চামড়া রাখা হলে রং ধরে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। তাই মাচা পেতে চামড়া রাখতে হবে।

(ঙ) শুকানোর পর চামড়া ভিজলে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

(চ) চামড়া বস্তাবন্দী করা বা পরিবহনের সময় চামড়া নষ্ট হতে পারে।

অনেক দুর্নীতিপরায়ণ চামড়া ব্যবসায়ী মাটিতে শুকানো চামড়া ফ্রেমে আটকিয়ে বিক্রি করে থাকে যা চামড়া শিল্পের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

চামড়া ছাড়ানোর পদ্ধতি

প্রধানত দু'ভাবে চামড়া ছাড়ানো যেতে পারে —

(১) (ক) মাথার চোয়ালের মাঝ থেকে পেটের মধ্য দিয়ে পায়ু পর্যন্ত সরল রেখার ন্যায় চামড়া কাটতে হবে।

(খ) চারপায়ের গোড়ালির চারদিকে ঘুরিয়ে চামড়া কাটতে হবে।

(গ) সামনের পায়ের ভিতরের দিকের মাঝখান দিয়ে গোড়ালি থেকে বুক পর্যন্ত কাটতে হবে।

(ঘ) পেছনের পায়ের পেছনের দিক দিয়ে গোড়ালি থেকে পায়ু পর্যন্ত কাটতে হবে।

এখন এক হাতে চামড়া ছাড়াতে হবে অন্য হাতে প্রয়োজনমতো চামড়া ছাড়িয়ে দিতে হবে। যখন পেটের চামড়া ছাড়ানো শেষ হবে তখন ছাগলটি ঝুলিয়ে নিয়ে বাকি চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে।

(২) ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে কেইসড চামড়া ছাড়ানো পদ্ধতি নামে অভিহিত করা যায়। এভাবে ছাড়ানো চামড়াকে কেইসড চামড়া বলে (চিত্র ৫৩)।

চিত্র ৫৩ : ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর কেইসড পদ্ধতি

চিত্রের মতো টানিয়ে পেছনের পায়ের দিকে কেটে আস্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ছুরির ব্যবহার নেই, হাতের সাহায্যে গ্লোভের (glove) মতো খুলে নেয়া হয়, এভাবে ছাড়ানো কেইসড চামড়ার মাংসযুক্ত দিক ধোয়া ও শুকানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হয়।

চামড়া ছাড়ানোর পর ধোয়া ও মাংস ছাড়ানো

চামড়া ছাড়ানোর পর পরই চামড়ার মাংসযুক্ত দিকটি ধুয়ে নিতে হবে, তবে পুরো চামড়াটি কোন পাত্রে ভিজানো যাবে না। চামড়াটি খুঁটির সাথে বেঁধে টানিয়ে নিয়ে পানি স্প্রে করে অথবা সমান্তরাল টেবিলের উপর চামড়াটি বিছিয়ে ধুয়ে নেয়া যেতে পারে, তবে পানি যাতে গড়িয়ে নিঃসৃত চামড়া থেকে লেগে থাকা মাংসপেশী বাঁ পর্দা ছাড়িয়ে নেয়া খুবই জরুরি তবে এগুলো আস্তে আস্তে বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলতে হবে। চামড়া যাতে কেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ সামান্য মাংস থাকলে যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে চামড়া কেটে ফেললে। চামড়ার চারধারে অসম টুকরাগুলো কেটে ফেলতে হবে। যতোটুকু সম্ভব বর্গাকার করার চেষ্টা করতে হবে।

চামড়া সংরক্ষণ

চামড়া সরাসরি চামড়া কারখানায় বা ট্যানারিতে (tannery) পাঠাতে না পারলে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। তিনটি পদ্ধতি এই কাজের জন্য অনুসরণ করা যেতে পারে —

(ক) ভেজা অবস্থায় লবণ প্রয়োগ

(খ) ঝুলিয়ে চামড়া শুকানো

(গ) শুকনো ও লবণ প্রয়োগ পদ্ধতি

নিচে ছাগলের চামড়া সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো —

(ক) চামড়া ছাড়ানো ও ধোয়া বা মাংস ছাড়ানোর পরপরই চামড়ার উপর মাংসযুক্ত অংশের দিকে লবণ বিছিয়ে দিতে হবে যতোক্ষণ পর্যন্ত না পানি চুষে নিতে পারে। সাধারণত প্রতিটি ছাগলের চামড়ার ২ থেকে ৩ কেজি লবণের ব্যবহার করতে হতে পারে। এরপর মাংসযুক্ত দিকটি লবণসহ ভিতরে রেখে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যে লবণ বের হয়ে যাচ্ছে না। এখন চামড়াটিকে কম্বল ভাঁজ করার মতো করে ভাঁজ করে নিতে হবে এবং এটির উপর ভারী ভার প্রয়োগ করে দু'দিন রাখতে হবে। এরপর রেখে অথবা ফ্রেমে ঝুলিয়ে শুকাতে হবে। চামড়ায় লবণ প্রয়োগ করার ১৫.৬° সেঃ (৬০° ফা) তাপমাত্রা থেকে আদর্শ তাপমাত্রা বেশি হলে চামড়ার ক্ষতি লবণ প্রয়োগ পদ্ধতিতে চামড়া সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য পদ্ধতি, তবু পৃথিবীর অনেক দেশে এটি বহুল ব্যবহৃত।

(খ) ঝুলিয়ে চামড়া শুকানোর পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন আকার বা ধরনের ফ্রেম বা র‍্যাকে চামড়া ঝুলিয়ে বাতাসে বা রোদে শুকিয়ে নেয়া যেতে পারে। বাতাসে শুকানো পদ্ধতিতে খোলা ঘরে ফ্রেমে চামড়াগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। সরাসরি সূর্যের রশ্মি বা বৃষ্টির পানি চামড়ার উপর পরতে না অথচ চামড়ার চারদিকে বাতাস লাগবে।

(গ) চামড়ায় লবণ প্রয়োগ ও শুকানো পদ্ধতিতে চামড়া শুকানো হলে গুণগত মান নষ্ট হয় না।

চামড়ার গুণগত মান রক্ষা

ছাগলের চামড়া সংরক্ষণের সময় গুণগত মান রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

১. চামড়ায় রক্ত, বর্জ্য, গোবর এইসব লাগলে তাড়াতাড়ি পচন ধরে।

২. চামড়া ছাড়ানো ও অন্যান্য প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করা হলে চামড়াতে রোগজীবাণু বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয় যার ফলে চামড়ার গুণগতমান নষ্ট হয় না।

৩. চামড়া সংরক্ষণের জন্য অনেক সময় আরসেনিক দ্রবণ ব্যবহার করা হতো কিন্তু এটি মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়া করতে পারে তাই এর ব্যবহার সীমিত করা উচিত।

৪. পৃথিবীর বিখ্যাত মরক্কো চামড়া ছাগলের চামড়া থেকেই তৈরি। ছাগলের চামড়া থেকে উন্নত মানের জুতো, দস্তানা, জ্যাকেট, বই বাঁধানো এবং বিভিন্ন জিনিষ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচের চিত্রে ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর (cased) পদ্ধতিটি দেখানো হচ্ছে—

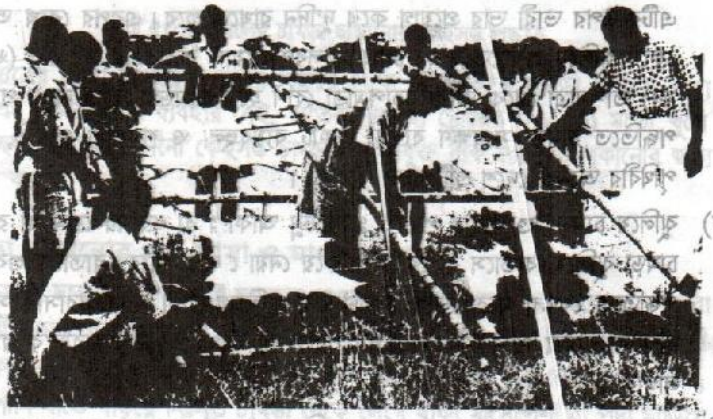

চিত্র ৫৪ ঃ কাঠের ফ্রেমে চামড়া শুকানোর পদ্ধতি

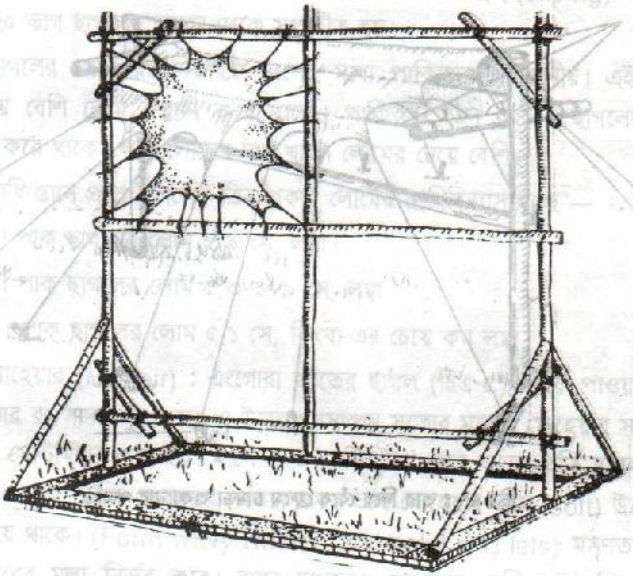

চিত্র ৫৫ ঃ স্থানান্তরযোগ্য ফ্রেমে চামড়া শুকানোর পদ্ধতি

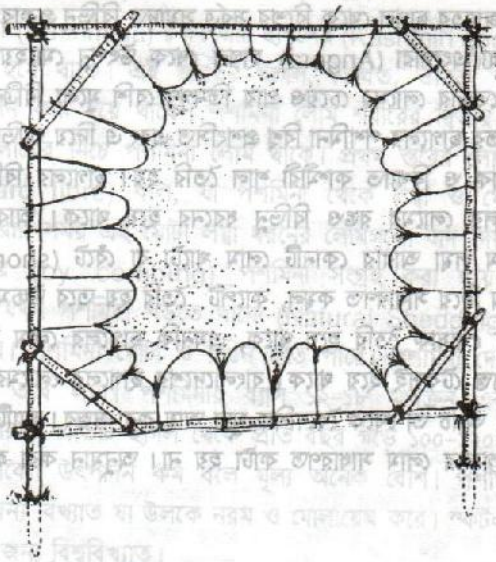

চিত্র ৫৬ ঃ মাটিতে বসানো ফ্রেমে চামড়া শুকানোর পদ্ধতি

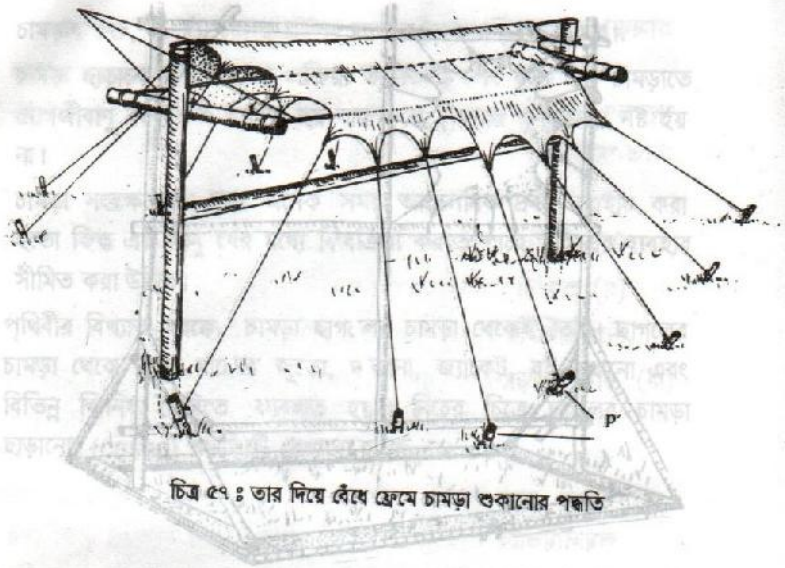

চিত্র ৫৭ : তার দিয়ে বেঁধে ফ্রেমে চামড়া শুকানোর পদ্ধতি

ছাগলের লোম

বিভিন্ন জাতের ছাগল থেকে বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত বিভিন্ন প্রকার পশম উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে এংগোরা (Angora) ছাগল থেকে উৎপন্ন মোহেয়ার (Mohair) সম্পন্ন এবং ভেড়ার লোমের চেয়েও প্রায় তিনগুণ বেশি মূল্যে বিক্রি হয়। কাশ্মীরের কাশ্মীরী জাতের ছাগলের পশমিনা বিশ্ব প্রশংসিত এবং এ দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের শীতের পোশাক ও বিখ্যাত কাশ্মীরী শাল তৈরি হয়। ছাগলের বিভিন্ন রং হওয়ার কারণে ছাগলের লোমের রঙও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ছাগলের লোম লম্বা আবার কোনটি লোম খাটো বা বেঁটে (short) হয়ে থাকে। ছাগলের লোম দিয়ে সাধারণত কম্বল, কার্পেট তৈরি হয় তবে উচ্চমানের লোম দিয়ে মানুষের জন্য পোষাক তৈরি হয়ে থাকে, এমনকি ছাগলের লোম দিয়ে রশি তৈরি হয়, যা অত্যন্ত টেকসই হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ছাগলের লোমের ব্যবহার তেমন প্রচলিত নেই, অথচ তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার ছাগলের লোম সাধারণত কাটা হয় না। অনুমান করা হয় যে, ব্যবহৃত

লোমের শতকরা ৮০ ভাগ ছাগলের শরীর থেকে কেটে সংগ্রহ (cliping) করা হয় বাকি ২০ ভাগ ছাগলের চামড়া থেকে সংগৃহীত হয়।

ছাগলের লোম রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে পাকিস্তান শীর্ষস্থানীয়। এই দেশটি সবচেয়ে বেশি লোম রপ্তানি করে থাকে। পাকিস্তান তিন ধরনের ছাগলের লোম রপ্তানি করে থাকে। লম্বা লোমের দাম খাটো লোমের চেয়ে বেশি।

পাকিস্তানে প্রাপ্ত ছাগলের তিন প্রকার লোমের শ্রেণিবিন্যাস হচ্ছে —

১। পাক ছাগলের লোম ৮.৯ সে. লম্বা।

২। পাক ছাগলের লোম ৫.৩-৮-৯ সে. লম্বা

৩। পাক ছাগলের লোম ৫.১ সে. কিংবা এর চেয়ে কম লম্বা।

মোহেয়ার (Mohair) : এংগোরা জাতের ছাগল (চিত্র ৫) থেকে পাওয়া যায়। এইগুলোর রং সাদা, খুব সুন্দর ও উন্নত গুণসম্পন্ন সুতোর মতো। মোহেয়ার সাধারণত ১০-২৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। মাসে ২-৩ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। প্রতি ছাগল থেকে গড়ে ২.৫-৪.৫ কেজি মোহেয়ার পাওয়া যায়। ভাল মোহেয়ার নরম (soft) উজ্জ্বল ও শক্ত হয়ে থাকে। (Form wavy twisted and solid ring lets) মসৃণতার উপর মোহেয়ারের মূল্য নির্ভর করে। বাচ্চা ছাগলের মোহেয়ার বেশি মসৃণ বিধায় মূল্য বেশি। মোহেয়ার চাদর ও কম্বল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পশমিনা (Pashmina) ঃ কাশ্মীরী ছাগলের (Kashmiri goats) লোমকেই পশমিনা বলা হয়ে থাকে। এই জাতের ছাগল, তিব্বত, ভারত, মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কিস্তানে পালন করা হয়ে থাকে। পশমিনা লোম শরীরের দ্বিতীয় সারির লোম। উপরিভাগের লোমের নিচে পশমিনা লোম থাকে। প্রথম স্তরের লোমগুলোকে গার্ড ফাইবার (guard fibre) বলে, যা পশমিনা থেকে লম্বা ও মোটা। পশমিনা প্রক্রিয়াজাত করার সময় এই মোটা লম্বা ধরনের লোমগুলো বাদ দেয়া হয়। চিরুণি দিয়ে আছড়িয়ে (by combing) পশমিনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে অথবা স্বাভাবিকভাবে যখন পশমিনা পড়তে থাকে (Natural Shedding) তখন হাতে সংগ্রহ করা হয়। পশমিনা মোটা ও রঙিন হতে পারে। পশমিনা দেখতে অনেকটা উলেরই মতো তবে লম্বা। পশমিনার ব্যাস ১২-১৮ মাইক্রন এবং লম্বা ২.৫ সেন্টিমিটার। ভারতে প্রতিটি ছাগল থেকে প্রতি বছর গড়ে ১০০-১২০ গ্রাম পশমিনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদন কম বলে মূল্য অনেক বেশি। পশমিনা মিহিত্বের (fineness) জন্য বিখ্যাত যা উলকে নরম ও মোলায়েম করে। স্কটল্যান্ডের উলের বস্ত্র পশমিনার জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

ছাগলের হাড়

ছাগলের শরীরের ওজনের শতকরা ১২-১৫ ভাগ হচ্ছে হাড়।

হাড়ের গুঁড়ো (Crushed bones) ঃ প্রক্রিয়াজাত করে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। হাড়ের গুঁড়া জমিতে খনিজ সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

হাড়ের গুঁড়ো, নাড়িভুড়ি মানুষের খাদ্যের অনুপযুক্ত মাংস দিয়ে হাঁস-মুরগি, কুকুর বিড়ালের খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার পূর্বে হাড়ের গুঁড়ো বা হাড়গুলোকে রোগ-জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বিশ পাউন্ড প্রেসারে ১৫ মিনিট বাষ্পতাপ (steam) দিলে রোগ-জীবাণুমুক্ত হয়। রোগ-জীবাণুমুক্ত হাড়ের সাথে অন্যান্য হাড় যাতে মিশে না যায় সেদিকে যত্নবান হতে হবে। কিন্তু যখন রোগজীবাণুমুক্ত করার জন্য শুষ্কতাপ (dry heat) ব্যবহার করা হবে। তখন তাপ ১৫৪° সেন্টিগ্রেডে তিন ঘন্টা তাপ দিতে হবে। অনেক সময় ধরে সিদ্ধ করলে (boiling) হাড় রোগ-জীবাণুমুক্ত হয়।

ছাগলের রক্ত

জবাই করা ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে এর ব্যবহার কতটা নিরাপদ বা বিপদজনক। কারণ সঠিকভাবে রক্ত সংগ্রহ করতে না পারলে কসাইখানার ময়লা আবর্জনার রোগ-জীবাণু দিয়ে সংগৃহীত রক্ত দুষিত (contaminated) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগিকে খাওয়ালে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ৪৫৪ কেজি ওজনের পশু থেকে ২.৭ কেজি ব্লাড মিল (blood meal) পাওয়া যায়।

রক্ত সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ —

১। রক্ত তাড়াতাড়ী পচে যায় ও গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

২। অপরিশোধিত রক্ত গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগিকে খাওয়ালে রোগ ছড়াতে পারে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু হতে পারে। এই দু'কারণেই রক্তের ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকতে হয়।

রক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি

১। শোষণ পদ্ধতি (Absorption) ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত রক্ত ভূষি, ক্যাসাভা বা ভুট্টার গুঁড়োর (flour) সাথে মিশিয়ে সাথে সাথে চাটাই বা ট্রেতে

নিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে নিম্নমানের খাদ্যকে পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করা যায়।

২। চুনের গুঁড়ো মিশিয়ে (Treated with Lime powder) ঃ শতকরা ৯১ ভাগ রক্তের সাথে এক ভাগ চুনের গুঁড়ো মিশালে কালো রাবারের মতো একটি পদার্থ তৈরি হবে। যদি ভেজা চুন ব্যবহার করা হয় তা হলে ৯৭ ভাগ রক্তের সাথে তিনভাগ চুন মিশাতে হবে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে, রক্ত বেশিদিন সংরক্ষণ করা হলে গুণগতমানের কোন পরিবর্তন হয় না। জমাটবাধা রক্ত পিণ্ড অনেকদূর পর্যন্ত বহন করা যায়, পরিবেশ দূষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত রক্ত শুকিয়ে দিলে গুণাগুণ আরও বাড়ে। এইভাবে তৈরি রক্ত অন্যান্য খাদ্য যেমন আলু, ক্যাসাভা, ইত্যাদির সাথে সিদ্ধ করে খাওয়ালে রোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অথবা ট্রেতে তাপ দিয়ে চুনমিশ্রিত রক্ত শুকিয়ে নেয়া যায়।

৩। জমাট বাঁধানো (Coagulation), নিংড়ানো (pressing) ও শুকানো পদ্ধতি (Drying) ঃ বেশি পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ করা গেলে এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা উত্তম। এই পদ্ধতিতে প্রথমে রক্ত ১৫-২০ মিনিট তাপ দেয়া হয় তাতে রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায়। এই জমাট বাঁধা রক্ত একটি পাতলা চটের বস্তায় অথবা মোটা কাপড়ের বস্তায় নিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে পানিটুকু নিংড়ে পড়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাঠের তক্তা দিয়ে চাপ দিলে জলীয় অংশ তাড়াতাড়ি নিংড়ে যাবে এরপর রক্ত পিন্ডগুলো রোদে অথবা কৃত্রিম তাপে শুকিয়ে নিতে হবে।

ক্যাসিং (Casings)

অন্ত্রকে ফাঁপানো নলে পরিণত করাকে ক্যাসিং (casing) বলা যেতে পারে। এটি তৈরি করা সহজ কাজ হলেও বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। যেসব ছাগল চড়ে বেড়িয়ে (grazing) বড় হয়েছে তাদের অন্ত্রের (intestines) ক্যাসিং এর কদর আরও বেশি। ক্যাসিং তৈরির পদ্ধতিটি হচ্ছে —

তন্ত্রের বাইরে থেকে এর সাথে সংযুক্ত সব চর্বি ও পর্দা (membrames) আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিতে হবে। অত্র তন্ত্রটি (intestines) ঠাণ্ডা পানিতে রাখা ভাল কারণ তাতে পচন রোধ হবে এবং চর্বি শক্ত হবে। অন্ত্রটি এক হাতে ধরে অন্য হাতে দুই আঙুল দিয়ে ভিতরের ময়লাগুলো (যেমন- গোবর) বের করে নিতে হবে। কাঠ অথবা বাঁশের কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে অন্ত্রের সংযুক্ত চর্বি ছড়িয়ে নিতে হবে। অন্ত্রের

বিভিন্ন আবরণকে খোসানোর (roose) জন্য পচন প্রক্রিয়ার (fermentation) প্রয়োজন। বিভিন্ন তাপমাত্রায় পচনক্রিয়ার সময় কম হতে পারে, তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্ত্রটি পরিষ্কার ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এতে সংযুক্ত মিউকাস কাঠের ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এইভাবে অন্ত্রটিকে মাংস, চর্বি ও ময়লামুক্ত করে স্বচ্ছ পর্দার ন্যায় করা হয় এবং এটিই হলো প্রকৃত ক্যাসিং । সমস্ত প্রক্রিয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে অন্ত্রের কোন স্থানে যেন ছিদ্র না হয়ে একটি ছাগলের অন্ত্র দিয়ে তৈরি ক্যাসিং (casing) এর দৈর্ঘ হয় ১৯.৮ — ২২.৯ মিটার (৬৫–৭৫ ফুট)।

এখন ক্যাসিংটিকে শোধন (curing) করতে হবে । শোধন দু'ভাবে করা যায় –

(ক) ক্যাসিং (Casing) –এ লবণ মেখে দু'সপ্তাহ রেখে দিতে হবে। এরপর ঝেকে (shaking) নিয়ে চাপ দিয়ে (coiled) রেখে দিতে হবে।

(খ) লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ (saturated salt solution) ঃ একটি কাঠের বালতিতে রাখা সম্পৃক্ত লবণের দ্রবণে ক্যাসিং আস্তে আস্তে ডুবাতে হবে। ক্যাসিং বালতিটিতে রাখার ফলে লবণের পানি বালতি থেকে পড়ে যেতে থাকে। ক্যাসিং-এ যখন বালতি পূর্ণ হবে তখন তা পরিবহনের জন্য প্রস্তুত।

গোবর ও চনা (Faces & urines)

সবুজ সার হিসেবে ছাগলের গোবর বা চনা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবহার করা হয়। ছাগলের গোবার বা চনা মূল্যবান জৈব সার। ভারতে কোন কোন অঞ্চলে এবং তুরস্কে আজও অনেক কৃষক তাদের জমিতে ছাগল চড়ানোর জন্য তথায় জমিতে জৈব সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রবিশেষে ছাগলের মালিককে অর্থ দিয়ে থাকে।

ছাগলের গোবর বা চনা জমির উর্বরতা বাড়ায়। কারণ জমির উর্বরতার জন্য দরকার পটাশ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, যার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাগলের গোবর ও চনায় রয়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, এক একর জমিতে ২০০০ ছাগলকে এক রাত রাখা হলে এক বছরের জন্য উক্ত জমিতে কোন প্রকার সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

এক এক দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস এক এক রকম। আফ্রিকায় একটি ছাগলের ৪৮.৩% মানুষ খায় ও বিক্রয় হয় ৫৫.৫%। মালয়েশিয়ায় একটি ছাগলের ৬১.২% মানুষ খায় এবং বিক্রি হয় ৮১.৫%। ছাগলের যকৃত হৃৎপিণ্ড ফুসফুস জিহ্বা (tongue) পাকস্থলী মগজ ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরা খাদ্য হিসেবেই গ্রহণ করে

থাকে, ফলে প্রতিটি ছাগল থেকে উপরে দেখানো হিসাবের চেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং বিক্রির পরিমাণও বেশি হয়।

ছাগলের উৎপাদন দক্ষতা

ছাগলের উৎপাদন সামগ্রী হচ্ছে—

১। মাংস (Meat)

২। দুধ (Milk)

৩। পশম (Poshmina)

৪। লোম (Hair)

এগুলো উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

ছাগলের জাত (breeds) ও দৈহিক গঠন (size) একটি থেকে অন্যটির মধ্যে এতো বেশি ব্যবধান থাকে যে, একটি সাধারণ সূত্রে এদের উৎপাদন দক্ষতা নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা বেশ জটিল। যাহোক, একটি সাধারণ সূত্র নিচে দেয়া হলো যা গাইড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে —

$$দ = \frac{উ}{খা} \times ১০০$$ যখন, দ = দক্ষতা

উ = উৎপাদন

খা = খাদ্য

যখন ছাগল থেকে কোন উৎপাদন হয় না তখন উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য। লোম বা পশম যখন বাড়ে না তখন উৎপাদন শূন্য, অর্থাৎ জীবিত প্রাণীতে উৎপাদন দক্ষতা, একটি আপেক্ষিক ধারণা। জীবিত ছাগলের লোম বা পশম বাড়বে অথবা সংখ্যায় কমবে বা বাড়বে। শরীরের কোষের ক্ষয় সাধন হবে তা পূরণ হবে, নতুনের জন্ম হবে- এটাই নিয়ম। তবে এইসব বাড়া-কমা যদি হিসাবে নির্ণয় করা না যায়, চোখে ধরা না পরে তাহলে তাকে "উৎপাদন" হিসেবে গণ্য করা হয় না। জীবিত ছাগল উৎপাদনে স্থিতিশীল বেশি দিন থাকে না গতি তাকে পেতেই হবে, তাই দক্ষতা বিবেচ্য।

উৎপাদন দক্ষতা নির্ণয় করার সময় খাদ্যের যেসব তথ্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে —

F = খা = খাদ্যগ্রহণ

DMI = শু প গ্র = শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ

DOM = প জৈ প = পরিপাকযোগ্য জৈব পদার্থ।
DCP = পূ প আ = পূর্বপরিপাকযোগ্য আমিষ।
D N = প না = পরিপাকযোগ্য নাইট্রোজেন।
ME = বি শ = বিপাকীয় শক্তি
NE = প্র শ = প্রকৃত শক্তি
TDN = মো প পু = মোট পরিপাকযোগ্য পুষ্টি
SE = শ স = শর্করা সমতুল্য

উৎপাদন দক্ষতা নির্ণয়ের সময় একই দলের বিভিন্ন ছাগলের উৎপাদন দক্ষতার একটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি (Standard) বা ক্ষমতা যাচাই করা হয়। একই দলের বিভিন্ন ছাগলের গড়ন কিংবা বাড়ন বিভিন্ন হয়ে থাকে, তাদের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ এবং এদের থেকে পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতা কম-বেশি হয়ে থাকে। তাই উৎপাদন দক্ষতা নির্ণয়ের সময় এইসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আরও যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে সেগুলো হচ্ছে- ছাগলের বয়স, প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ছাগলের পুষ্টির জন্য ব্যয়িত খরচের পরিমাণ এবং দলে মৃত্যু হার।

মাংস উৎপাদনে দক্ষতা (Efficiency of meat Production)

একই জাতের ছাগলের (Wittin the species) বয়স বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ছাগলের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকলেও উৎপাদন দক্ষতায় (weight gain) একই থেকে যায়, ফলে এ বয়সের দ্রুত বাড়নশীল জাতের (faster goowing breeds) ছাগলের শরীরের ওজন বৃদ্ধির সাথে ধীরে বাড়নশীল জাতের ছাগলের (slow growing breeds) শরীরের ওজন বৃদ্ধির তারতম্য তেমন একটা দেখা যায় না। মোটামুটি বয়সের মিল রেখে দল গঠন করলে মাংস উৎপাদন দক্ষতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

যেসব অবস্থা বা কারণ শরীর বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলো হচ্ছে —

১। অনিয়মিত খাদ্য সরবরাহ
২। অপুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ
৩। অসম খাদ্য সরবরাহ
৪। আবহাওয়ার তারতম্য
৫। রোগ-ব্যাধি।

ছাগলে মাংস উৎপাদন দক্ষতা যাচাই নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। তাই এই বিষয়ে তথ্যের অভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শর্করা ও আমিষ বিবর্তনের (conversion) শতকরা হার যথাক্রমে ৪.৭ এবং ৯.১। পক্ষান্তরে ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাইয়ে শর্করা ও আমিষের বিবর্তনের শতকরা হার যথাক্রমে ৬.৭ ও ১০.২।

যেসব ছাগল প্রজনন কাজের উপযুক্ত নয় সেইসব ছাগলকে খামার থেকে বাদ দিতে হবে। পাঠা ছাগল খামারের চাহিদার থেকে বেশি হলে সময়মতো সেগুলোকে খাসি (Ceastrated) করিয়ে এবং বাদ দেয়া ছাগলগুলোকে মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা যেতে পারে। এবং দক্ষতা নির্ণীত হবে এইভাবে —

$$দ = \frac{\text{মাংসের পরিমাণ}}{\text{গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ}} \times ১০০$$

সারণি ৩৮ ঃ ছাগলের শক্তি ও আমিষজাতীয় খাদ্যের বিবর্তন প্রক্রিয়ার দক্ষতা

ছাগলের উৎপাদন প্রক্রিয়া	দক্ষতার শতকরা হার (% Efficiency)		আমিষের শক্তি মূল্য (Energy cost of pooteins) (g/M cal/ ME)
	শক্তি (Energy)	আমিষ (Protein)	
দুধ উৎপাদন (Lactation)	২৪	২৩.৭	১৪.৫
মাংস উৎপাদন (Fattening)			
শুধু ঘাস	৪.৭	৯.১	৫.১
ঘাস ও দানাদার খাদ্য	৬.৭	১০.২	৭.৫

(১) শক্তি = কিলোক্যালরি/১০০ কিলোক্যালরি বিপাকীয় শক্তিসম্পন্ন গৃহীত খাদ্য
(২) আমিষ = খাদ্যযোগ্য আমিষ গ্রহণের পরিমাণ
(৩) খাদ্যযোগ্য আমিষ প্রতি M cal বিপাকীয় শক্তি (ME)
সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

ছাগল যা খায় তার পুষ্টি দিয়ে দেহ রক্ষণাবেক্ষণ, গর্ভের বাচ্চার পুষ্টিসাধন (যদি থাকে) ও দুধ উৎপাদন প্রভৃতি কাজ সমাধা হয়ে থাকে। কোন কোন গর্ভবতী ছাগল এক বা দুয়ের অধিক বাচ্চা ধারণ করে থাকে, তাই স্বাভাবিক হিসাবে দেয় খাদ্য দিয়ে দেহের এই পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারে না এবং এরজন্য দরকার অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ।

দুধ উৎপাদনের দক্ষতা (Efficiency of milk production)

ছাগল দুধ উৎপাদনের সবশেষ সীমায় পৌঁছায় বাচ্চা দেবার ৮-১২ সপ্তাহ পর। ছাগলের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ, দেহের আকার ও ওজন বিবেচনায়, ছাগল, গাভি ও

মহিষ থেকে বেশি দুধ উৎপাদন করে থাকে। ছাগলের শরীরের ওজনের অনুপাতে উলানের ওজন ও আকার, গাভি ও মহিষের অনুপাত থেকে বেশি। ছাগলের দুধ উৎপাদন দক্ষতা ২১-৩০% এবং গাভির ২৫%।

দুধ ও মাংস থেকে আমিষ প্রাপ্তির পরিমাণ (Yield of Proteins from Meat and Milk)

দশ গ্রাম উদ্ভিজ্জ আমিষ (plant protein) একটি ছাগলকে খাওয়ালে আমিষ হিসেবে পাওয়া যাবে ১ গ্রাম। তবে এই একগ্রাম-প্রাণিজ আমিষ অত্যন্ত উন্নতমানের হয়ে থাকে। তা ছাড়া যে ধরনের উদ্ভিজ্জ আমিষ খাওয়ানোর ফলে প্রাণিজ আমিষ পাওয়া গেছে সেই জাতীয় উদ্ভিজ্জ আমিষ সাধারণত মানুষ খেতে পারে না। অর্থাৎ ১০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণীর দেহে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক গ্রাম প্রাণিজ আমিষে রূপান্তরিত হয়।

মাংস ও দুধ উৎপাদনই হলো সকল ছাগল পালনের মূল বিষয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দুধের আমিষ মাংসের আমিষ থেকে উৎকৃষ্ট।

সকল প্রজাতির মাংসেই আমিষজাতীয় উপাদানের উপস্থিতি ১৫-২৫%। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন পদ্ধতির দুধে আমিষের উপস্থিতির পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যে জাতের প্রাণীর দ্রুত দেহ বৃদ্ধি হয় সেই জাতের প্রাণীর দুধে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। মানব শিশুর দেহ বৃদ্ধি ছাগ-শিশু অপেক্ষায় ধীরে হয়। বিভিন্ন প্রজাতির দুধে আমিষজাতীয় উপাদানের উপস্থিতি হচ্ছে —

সারণি ৩৯ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর দুধে আমিষের পরিমাণ

প্রজাতি (species)	আমিষের পরিমাণ (%)
ছাগীর দুধ	৪.৩
মুরাহ্ মহিষের দুধ	৩.৯
ইউরোপীয় গাভীর দুধ	৩.৪
বাংলাদেশী গাভীর দুধ	২.৮
মানব দুগ্ধ	১.৫

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

মাংসের জন্য পালিত (Meat goads) ছাগল থেকে দুধের জন্য পালিত ছাগলে (Dairy goats) আমিষ উৎপাদনের ক্ষমতা দেশী ছাগলে ৭ গুণ এবং বিদেশী উন্নতজাতের ছাগলে ৩৯ গুণ।

আমিষ গ্রহণ ও আমিষে পরিবর্তন (conversion) বিভিন্ন জাতের ছাগলে ও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। ছাগলের দুধে আমিষ উৎপাদনের দক্ষতা ১০.৯–২৫.৯%। অস্ট্রেলিয়ায় সানেন জাতের ছাগলের আমিষ উৎপাদনের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি (২৯.৪%) (সারণি ৪১) গ্রীষ্মমণ্ডলে বৃটিশ আলপাইন ও এ্যাংগলো নিউবিয়ান সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে ২১.২ ও ২৩.৭ সবচেয়ে কম হচ্ছে ইণ্ডিয়ান বিটাল (Beetal)।

সারণি ৪০ঃ ছাগলের আমিষ উৎপাদনের হিসাব (Protein Production from goats)

	দুধের ছাগল		মাংসের ছাগল
	শীতপ্রধান দেশ	গ্রীষ্মপ্রধান দেশ	গ্রীষ্মমণ্ডল
বাৎসরিক উৎপাদন (কেজি/ছাগল)			
প্রতিবার দুগ্ধদানকালে (Lactation)	১৪.৮০	২৮০(১)	
গড়ে আমিষ উৎপাদন (Yeild of Milk protein)	৫৪.৮	১০.৪(১)	১.৪(১)
সারা জীবনের উৎপাদন (কেজি/ছাগল)	৬০০০	১১০০(১)	
চারবার দুগ্ধদানকালে		২৩০০(৩)	
আমিষ উৎপাদন	২২২.০	৪০.৭(১)	৮.৩(৪)
		৮৫.৮(৩)	
বাৎসরিক উৎপাদন (কেজি/ হেক্টর)			
গড় দুধ উৎপাদন (Average Milk Yield)		৫৯৭০(৫)	
গড়ে দুধের আমিষ উৎপাদন (milk protein)		২২০.৯(৫)	
গড় দুধ উৎপাদন (Average Milk Yield)		১১১২০(৬)	
গড়ে দুধের আমিষ উৎপদান (Milk protein)		৪১১.৪(৬)	

(১) গ্রীষ্মমণ্ডলের স্থানীয় ছাগল

(২) এক প্রসবকালে বাচ্চার সংখ্যা ২, জবাই করার পর মাংসের পরিমাণ ৫ কেজি আমিষ হচ্ছে ১৬%

(৩) গ্রীষ্মমণ্ডলে উন্নত জাতের দুধের ছাগল

(৪) লিটার সাইজ (Litter size) ৮, মৃত্যুর হার ২৫%, জবাই করার পর মাংসের পরিমাণ ১০ কেজি এবং আমিষের উপস্থিতি ১৬%

(৫) স্থানীয় জাতের ছাগল। উন্নত মানের গিনি ঘাসের ১৪ টন শুষ্ক পদার্থ উৎপাদন, বাৎসরিক শুষ্ক পদার্থের চাহিদা ৬৬০ কেজি।

গড়ে প্রতি দুগ্ধদানকালে দুধ উৎপাদন ২৮০ কেজি।
জীবন্ত ওজন ৪৫ কেজি।

(৬) গ্রীষ্মমণ্ডলে বিদেশী ছাগল যাদের খাদ্য গিনি ঘাস।
প্রতি দুগ্ধদানকালে দুধ উৎপাদন ৫৮ কেজি। গড় জীবন্ত ওজন ৫০ কেজি।

সূত্র : উইলিয়ামস, ১৯৭৮

সারণি ৪১ ঃ দুগ্ধবতী ছাগলের আমিষ গ্রহণ ও আমিষ উৎপাদনের দক্ষতা

জাত (Breed)	দেশ	আমিষ গ্রহণ গ্রাম/দিন	উৎপাদন গ্রাম /দিন	দক্ষতার ٪ (Efficiency)
বৃটিশ আলপাইন (British alpine)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৬৭.৪	৫৬.৭	২১.২
এ্যাংলো নিউবিয়ান (Anglo-Nubian)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৩৫.২	৪৫.৬	১৯.৪
এ্যাংলো নিউবিয়ান × স্থানীয় শঙ্কর Anglo-Nubian x local cross	মালয়েশিয়া	২৫০.২	৫৯.৩	২৩.৭
আলপাইন (Alpine)	মালয়েশিয়া	২৬০.২	৪৯.৪	১৯
বিটাল (Beetal)	ভারত	২০৫.৫	৩২.৯	১৬
আলপাইন × বিটাল ক্রসব্রিড Alpine x Beetal cross breeds	ভারত	২৬০.২	৪৯.৪	২০
বিটাল (Beetal)	ভারত	২১৬.৬ ১১২.১ ১০৬.৪	২৩.৬ ২৫.৫ ২৪.৯	১০.৯ ২২.৭ ২৩.৪
সানেন (Saanen)	অস্ট্রেলিয়া	২৭৮৬ ৩১১.৬	৭২.২ ৯১.৬	২৫.৯ ২৯.৪

(১) দক্ষতা হিসাব করা হয়েছে, দ = $\frac{\text{দুধে আমিষের পরিমাণ}}{\text{খাদ্যে আমিষের পরিমাণ}} \times ১০০٪$

(২) শতকরা ৫০ ভাগ ইউরিয়া ও বিউরেট (Biuret) এর অবদান (contribution) থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছাগলের প্রজনন

ছাগলের প্রজননিক আচরণ

বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পিত ছাগল প্রজননই ছাগলের মানোন্নয়নের একমাত্র স্থায়ী পন্থা। এর কোন বিকল্প নেই। কৌলিতত্বের (genctical) নীতি সূত্র প্রজননের (reproduction) ভিত্তিতে ছাগল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগই ছাগল প্রজনন। সারা বিশ্বের পশুবিজ্ঞানীরা এইজন্য দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। যেমন–

ক) অবিরত বাছাই

খ) সমাগম

সুপরিকল্পিত প্রজননের মাধ্যমেই ভাল জাতের অধিক উৎপাদনক্ষম ছাগলের জাত সৃষ্টি করা সম্ভব। যে চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো আকাংঙ্কিত সেইগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রজনন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে –

১। দৈহিক বৃদ্ধিগত (Structural characteristics)

(ক) জন্মের সময় ওজন।

(খ) দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন।

(গ) যৌন পরিপক্কতা, ওজন ও বয়স।

(ঘ) দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার।

২। প্রজনন বৈশিষ্ট্য (reproduction charaeteristics)

(ক) প্রথম গর্ভধারণ সময়ে দেহের ওজন ও বয়স।

(খ) প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স।

(গ) দ্বিতীয় প্রসবে ওজন ও বয়স।

(ঘ) বাচ্চাদান অন্তবর্তীকাল।

(ঙ) পাঠার শুক্রাণুর মূল্যায়ন (প্রতি স্খলনে শুক্র সংখ্যা নড়ন হার)।

(চ) প্রতি গর্ভধারণ কালে পাল দেওয়ার সংখ্যা।

৩। **উৎপাদন বৈশিষ্ট্য** (Productive Characteristics)

(ক) ছাগলের উৎপাদিত দুধের পরিমাণ।

(খ) প্রতি ছাগলের উৎপাদিত মাংসের পরিমাণ।

(গ) মানুষের খাদ্যোপযোগী (edible percentage) বস্তুর প্রাপ্তির হার।

(ঘ) ড্রেসিং-এর শতকরা হার।

(ঙ) লোমের সূক্ষ্মতা ও দৈর্ঘ্য।

(চ) পশমের সূক্ষ্মতা ও দৈর্ঘ্য।

(ছ) প্রতি কর্তনে পশম বা লোমের পরিমাণ।

(জ) চামড়ার গুণাগুণ (চামড়ার গুরুত্ব ও লোমের ঘনত্ব)।

সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী, স্বজাতীয় ভাল গুণাবলীর উত্তরাধিকারী ছাগলই প্রজননের জন্য নির্বাচন করতে হবে। যে জাতের ছাগলের শিং রয়েছে সেইজাতে শিং ছাড়া পাঠা প্রজননের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ তাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ শিং ছাড়া সানেন (Saanen) জাতের ছাগল উভলিঙ্গী (hermaphrodites) হয়ে থাকে।

লিঙ্গ কোষ ও ক্রোমোজোমের সংখ্যা

স্ত্রী ছাগলের ডিম্বাণু ও পাঠার শুক্রাণু মিলনের পর ছাগলের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এদের মিলনকে নিষেক (fertilization) বলে। প্রতিটি ডিম্বাণু বা শুক্রাণুতে ৬০টি করে ক্রোমোজোম থাকে। এইগুলোর মধ্যে একজোড়া করে লিঙ্গ ক্রোমোজোম থাকে। এইগুলো দিয়ে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বাকি ২৯ জোড়া ক্রোমোজোমকে অটোজোম (autosome) বলে। পুরুষ ছাগলের লিঙ্গ ক্রোমোজোমের আকৃতি (XY) এবং স্ত্রী ছাগলের ক্রোমোজোমের আকৃতি (XX)। অর্থাৎ শুক্রাণু ক্রোমোজোম হচ্ছে X 3Y এবং ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম হচ্ছে X 3X।

নিষেকের সময় শুক্রাণুর X ক্রোমোজোম যদি ডিম্বাণুর X ক্রোমোজোমের সাথে মিলিত হয় তবে XX অর্থাৎ স্ত্রী বাচ্চা ছাগল জন্ম নেবে। আবার শুক্রাণুর X

ক্রোমোজোম যদি ডিম্বাণুর X ক্রোমোজোমের সাথে মিলিত হয় তবে XY অর্থাৎ পুরুষ বাচ্চা ছাগল জন্ম নেবে। তবে এটি অনেকটা আকস্মিক বা দৈব। বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

স্ত্রী ছাগলে কোন বয়সে প্রথম বাচ্চা দেওয়ার বয়স

ছাগলের বাচ্চা দেয়ার বিষয়টি আর্থিক কারণে খামার মালিকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। যদি ছাগল অল্প বয়সে বাচ্চাদের তাহলে মালিক অল্পসময় পালন করেই লাভবান হতে শুরু করেন।

সাধারণত ৪-৬ মাস বয়সেই ছাগ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে তবে, উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা অল্প বয়সের ছাগলকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করার বিপক্ষে। কারণ মায়ের দৈহিক বাড়ন ও পেটের শিশু ছাগলের বাড়ন প্রক্রিয়া একই সাথে চলা অধিক উৎপাদন প্রাপ্তির পরিপন্থী। এজন্য আদর্শ খামার ব্যবস্থাপনায় স্ত্রী ছাগলের বয়স হলে প্রথম প্রজনন করানো হয় যাতে প্রথম বাচ্চা প্রসব হয় ১৮ মাস বয়সে। তবে অপরিকল্পিতভাবে পালিত ছাগল সাধারণত ১০-১২ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা প্রসব করে থাকে।

ইস্ট্রাস চক্র (Oestrus cycle)

আঠার থেকে একুশ দিন পরপর স্ত্রী ছাগল গরম হয়ে থাকে। গরমকাল স্থায়ী হয় ১২-২৪ ঘন্টা গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিকাংশ ছাগল সারাবছর ধরে গরম হয়, তবে দুধের ছাগল (dairy goats) বিশেষ সময়ে গরম হয়ে থাকে যেমন এঙ্গোরাম জাতের ছাগল। কোন কোন এলাকার ছাগল বছরের বিশেষ সময়ে গরম হয়ে থাকে।

ভারতের ছাগল জুন-অক্টোবর মাসে বেশি গরম হয় ;

বৃটেনের ছাগল আগস্ট-ফেব্রুয়ারি মাসে বেশি গরম হয় ;

ক্যারিবিয়ান অথবা ভেনেজুয়েলায় ছাগল আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বেশি গরম হয় ;

যেসব কারণ ছাগলের গরম হওয়ার প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে সেগুলো হচ্ছে —

১। বৃষ্টিপাত,

২। প্রচুর ঘাসপ্রাপ্তি,

৩। দুগ্ধদান – দুধ দেয়া ছাগলের বাচ্চাদান বিরতিকাল (Kidding inteval) দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে যেমন এ্যাংগ্লো নিউবিয়ান জাতের সংকর ছাগলের বাচ্চাদান বিরতিকাল হচ্ছে ৩২৭ দিন। মালয়েশিয়ার স্থানীয় ছাগলে এই সময় হচ্ছে ৯০–১২০ দিন। মাংসের জন্য পালিত ছাগলের বাচ্চাদানের বিরতি কাল কম হয়ে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের ছাগল দু'বছরে তিনবার অথবা বছরে দু'বার বাচ্চা প্রসব করে থাকে। স্ত্রী ছাগল গরম হওয়ার শেষ দিকে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু (ovum) বের হয় যা প্রায় ১২ ঘন্টা পর একবার ও ২৪ ঘন্টা পর আরেকবার পাল দেয়া উচিত।

বয়সের সাথে এক প্রসবকালে ২/৩টি বাচ্চা প্রসব সম্পর্কযুক্ত। ভারতের মালাবার জাতের ছাগল প্রথম প্রসবের সময় ১৯% ছাগল দুটি বাচ্চা প্রসব করে থাকে কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রসবকালে (second Kidding) এবং পরবর্তীকালে তা ৭৯%-এ উন্নীত হয়। বাচ্চা উৎপাদনের সর্বোচ্চ সংখ্যা পৌছে ৪–৬ বছর বয়সে। প্রতি ২০টি ছাগলের জন্য একটি সক্রিয় পাঠা রাখা হলে গরম হওয়ার প্রক্রিয়া তরান্বিত হয় সারণিতে তে তা দেখানো হলো–

নিচের সারণিতে স্ত্রী ছাগলের সাথে পাঠা রাখা হলে কতদিনে কত শতাংশ ছাগল গর্ভবতী হয় তা দেখানো হলো—

পাঠা রাখার সময় (দিন)	৫	১৫	২৫	৩৫	৪৫
গর্ভধারণের শতকরা হার	২৫	৫০	৬০	৬০	৭০

ছাগলের গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ (Signs of oestrns)

১। লেজ এদিক সেদিক ও উপর নিচে নাড়াচাড়া করা।

২। যোনিপথ (valva) লাল হওয়া ও ফুলে যাওয়া।

৩। যোনিপথে আঠালো রস (mucus) নিঃসৃত হওয়া যা ছাগলের লেজের লোমে মেখে থাকতে দেখা যায়।

৫। অনবরত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দ করা

৬। খাদ্যে অরুচি

৭। দুধ কমে যাওয়া।

উর্বরতা (Fertility)

স্ত্রী ছাগল যদি নির্দিষ্ট সময়ে ও সময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্যবান বাচ্চা ছাগল প্রসব করতে পারে তা হলে বিবেচনা করতে হবে যে ছাগল উর্বর অর্থাৎ ছাগলটির বাচ্চা জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

ছাগলের উর্বরতা ক্ষমতাকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা যায়

১। প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য কতবার পাল দিতে হয়েছে (service per conception)

২। প্রতিবারে কয়টি বাচ্চা প্রসব করে (Litter size)

৩। প্রতিবারে বাচ্চাদানের হার বা শতকরা হিসাব (kidding rate or %)

৪। বাচ্চা প্রসবের বিরতিকাল (kidding interval)

৫। পাল দেয়ার সময় (service period)

৬। গর্ভধারণ হার (Non-return rate)

এ ছাড়াও এই কাজে অন্য কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এইসব পদ্ধতি হচ্ছে —

১। যৌন পরিপক্বতার বয়স (age of puberty)

২। প্রথম বাচ্চা প্রসবের বয়স (age at 1st Kidding)

৩। গরম হওয়ার নিয়মানুবর্তিতা (regularity of oestrus cycle)

৪। প্রথম পাল দেয়া ও গর্ভধারণের ব্যবধান (যদি থাকে)

৫। প্রথম গরম হওয়া ও বাচ্চা প্রসবের মধ্যে ব্যবধান

৬। প্রথম পাল দেয়া ছাগলের গর্ভধারণের শতকরা হার

৭। গড়ে সারা জীবনে কয়টি ছাগল বাচ্চা জন্ম দিয়েছে

৮। খামারে প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত রোগ-ব্যাধি সংক্রান্ত সমস্যা।

১। প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য কতবার পাল দিতে হয়েছে (services per conception)

গড়ে খামারে প্রতিটি গর্ভধারণের জন্য ছাগলকে কতবার পাল দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে তা রেকর্ড করে রাখতে হবে। পাঠার পেটের নিচের অংশ রং ব্যবহার করা যায় যা স্ত্রী ছাগলের উপর চড়লে সেটির গায়ে রঙিন দাগ লাগবে যা প্রমাণ করবে যে ছাগলটি পাঠা দ্বারা পাল দেয়া হয়েছে।

৫টি স্ত্রী ছাগল মারা যায় তা হলে দলে স্ত্রী ছাগলের সংখ্যা হচ্ছে ৯০ এবং জীবিত বাচ্চার সংখ্যা হচ্ছে ১২৬। সুতরাং বাচ্চা পালনের শতকরা হার হচ্ছে ১৪০।

৪। **প্রসব অন্তবর্তীকাল** (Kidding interval)

দুটি প্রসবকালের মধ্যবর্তি বিরতি সময়কে প্রসব অন্তবর্তীকাল বলা হয়, এটি ছাগলের জাতের মধ্যে উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে ছাগল পাল দেয়ার পর জীবিত বাচ্চা প্রসব করে এবং যথারীতি বাচ্চা উৎপাদন সক্ষম (দুধ/মাংস/পশম/লোম) হয় সেগুলোকেই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। বন্ধ্যা কিংবা বাচ্চা উৎপাদন করে না- এমন ছাগলকে দলের উর্বরতা দক্ষতা হিসাবের জন্য ধরা হয় না।

৫। **গর্ভকাল** (Gestation period)

বিভিন্ন জাতের ছাগলের বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া গর্ভকালে পার্থক্য হয় যা সারণি ৪০-এ দেখানো হয়েছে। ছাগলের গড় গর্ভকাল ১৪৬ দিন এবং মাত্রা (range) হলো ১৪৪- ১৫৩ দিন।

৬। **ছাগীকে পাল দেয়ার সময়** (Service Period)

সঠিক সময়ে স্ত্রী ছাগলকে পাল দেয়ার উপরই খামারের ছাগলের উর্বরতা ও উৎপাদন দক্ষতা নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতের ছাগলের পাল দেয়ার সময় বিভিন্ন হতে পারে, তবে খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে তা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনা সম্ভব। ছাগল গরম হওয়ার সময়টি সঠিকভাবে নির্ণয় করে যথাসময়ে পাল দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে বাচ্চা প্রসবের অন্তবর্তীকাল কমিয়ে আনা যায়। খামারের ছাগলের উর্বরতা ও উৎপাদন দক্ষতা সংরক্ষণ করতে হলে বাচ্চাদান অন্তবর্তীকালীন সময় কমাতে হবে।

সাধারণভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলের স্থানীয় ছাগলের মধ্যে বাচ্চা উৎপাদনের বিরতিকাল কম অর্থাৎ ৯০-১৫০ দিন পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ান জাতের ছাগলের ১৬৯-৩২৭ দিন। গ্রীষ্মমণ্ডলের ছাগল বছরে দুবার কিংবা দু বছরে তিনবার বাচ্চা দিয়ে থাকে অথচ ইউরোপিয়ান ছাগল বিশেষ সময়ে গরম হয় বলে বছরে মাত্র একবার বাচ্চা নিয়ে থাকে। অনেকের অভিমত গ্রীষ্মমণ্ডলে সারা

২। প্রতি প্রসবকালে বাচ্চা প্র

এই সংখ্যা দিয়ে

১০

দক্ষ

প্রসবে

করে।

সারাজীব

মূল্যায়ন

যা শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যায়

র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে

।

১৬২

য়া সময় গর্ভকালীন সময় ও বাচ্চা প্রসবের

র সারণিতে দেখানো হলো।

৩। বাচ্চা প্র

Perc

এই

প্র

		পালদেয়ার সময় দিন	গর্ভকাল দিন	প্রসব অন্তবর্তী কাল
	ান (এনি)		১৪৮	
			১৪৫	
			১৫২	
			১৫১	
	এ্যাংগ্লো–নিউবিয়ান (এনি)	৩২৭	১৫৩	৪৮০
	ক্যাটজাং সংকর (কে স)	৯২	১৪৮	২৪০
	$\frac{১}{২}$ এনি × কে স	২০৩	১৪৮	৩৫১
	$\frac{১}{৪}$ এনি × কে স	২০৪	১৪৭	৩৫৭
মরিশ্যাস	এংগ্লোনিবিয়ন (এনি			৩৬৩
	$\frac{৭}{৮}$ এনি × $\frac{১}{৮}$ স্থানীয়			৩৭২
ত্রিনিদাদ	এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন বৃটিশ আল্পাইন খাটি ও শংকর	১৫৯	১৪৭	৩১৬

দেশের নাম	জাত (Breeds)	পালদেয়ার সময় দিন	গর্ভকাল দিন	প্রসব অন্তবর্তী কাল
ভারত	এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন			৩৩৫
	ফ্রান্স আলপাইন			৩৫০
	বরবারী		১৪৬	২৪২–২৪৯
	যমুনাপারী		১৫০	৩০০–৪৮৪
	ব্লাক বেংগল		১৪৪	৩২৮
	মালাবার		১৪৬	২৯৯
	মালাবার × যমুনাপারী			৩৮৫
	স্থানীয়	৯০–১২০	১৫০	২৪০–২৭০
বাংলাদেশ	ব্লাক বেঙ্গল		১৪৩	১৫১
শ্রীলঙ্কা	দক্ষিণ ভারতীয়			৩২৮
ফিলিপাইন	স্থানীয়		১৪৮	
ঘানা	পশ্চিম আফ্রিকার বামন			২৫৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	বোয়ার (Boer)	১৫০		
উগাণ্ডা	পূর্ব আফ্রিকান		১৪৭	
	মিউবেণ্ডি (Mubende)		২৯৭	

সূত্র ঃ দেবেন্দ্র, ১৯৭৪

দেশের নাম	জাত (Breeds)	পালদেয়ার সময় দিন	গর্ভকাল দিন	প্রসব অন্তবর্তী কাল
ভারত	এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন			৩৩৫
	ফ্রান্স আলপাইন			৩৫০
	বরবারী		১৪৬	২৪২–২৪৯
	যমুনাপারী		১৫০	৩০০–৪৮৪
	ব্লাক বেংগল		১৪৪	৩২৮
	মালাবার		১৪৬	২৯৯
	মালাবার × যমুনাপারী			৩৮৫
	স্থানীয়	৯০–১২০	১৫০	২৪০–২৭০
বাংলাদেশ	ব্লাক বেঙ্গল		১৪৩	১৫১
শ্রীলঙ্কা	দক্ষিণ ভারতীয়			৩২৮
ফিলিপাইন	স্থানীয়		১৪৮	
ঘানা	পশ্চিম আফ্রিকার বামন			২৫৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	বোয়ার (Boer)	১৫০		
উগাণ্ডা	পূর্ব আফ্রিকান		১৪৭	
	মিউবেণ্ডি (Mubende)		২৯৭	

সূত্র ঃ দেবেন্দ্র, ১৯৭৪

সারণি ৪৩ ঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের বিভিন্ন জাতের ছাগলের প্রজনন ক্ষমতা
(Reproductive performence)

দেশের নাম	জাত	প্রথম বাচ্চা প্রসব করার বয়স (মাস)	এক প্রসবে বাচ্চা দেয়ার সংখ্যা	প্রতি গর্ভধারণের জন্য পাল দেয়ার সংখ্যা
মালয়েশিয়া	এ্যাংগ্লো–নিউবিয়ন (এনি)		১৪৩	
	এনি x ক্যাটজাং	১৪–১৭	১.৬৭–২.০৩	
	ক্যাটজাং	১৫–১৬	১.৬৫	
ইসরাইল	এ্যাংগ্লো–নিউবিয়ন (এনি	১২–২৪	১.৭৫	
	দামাস্কান	২৪	১.৭৬	
	সানেন	১২	১.৯০	
	সিরিয়ান মাউনটেন্ট	১২–২৪	১.৪৪	
মরিসিয়ান	এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন	২৯	২.২৯	
	এনি x ক্যাটজাং	২১	২.৪৫	
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	এংগ্লো নিউবিয়ন	১২–১৫	২১.৮	
	বৃটিশ আলপাইন	১২–১৫	১.৮	
ভারত	এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন	২৫.৪		
	ফ্রান্স আলপাইন	২০.৮		
	বরবারী		১.৮০–২.০৮	
	যমুনাপারী	২৫.১	১.১১–১.৫৩	
	বিটাল	২২	১.৫০–২.৫০	
	মালবারী	১৮	১.৭	
	যমুনাপারী × মালবারী	১৬	–	

দেশের নাম	জাত	প্রথম বাচ্চা প্রসব করার বয়স (মাস)	এক প্রসবে বাচ্চা দেয়ার সংখ্যা	প্রতি গর্ভধারণের জন্য পাল দেয়ার সংখ্যা
বাংলাদেশ	ব্লাক বেঙ্গল	১৫		১.১
দক্ষিণ আফ্রিকা	বৃটিশ আলপাইন		১.৯১	
	সানেন		১.৬৩	
	টুগেনবারগ		১.৭৩	
উগাণ্ডা	পূর্ব আফ্রিকান	১৯		২.৩
তুরস্ক	ফিলিস (kilis)		১.২৭	
ফিলিপাইন	স্থানীয়	১৫		
ব্রাজিল	স্থানীয়			১.৫
সাইপ্রাস	মালটিসি/দামাস্কাস		১.৮৫	
শ্রীলঙ্কা	দক্ষিণ ইণ্ডিয়ান	১৯		
ঘানা	পশ্চিম আফ্রিকার বামন	১২		

সূত্র : দেবেন্দ্র, ১৯৭৪

BANSDOC Dhaka

ছাগলের উর্বরতায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কারণসমূহ (Factors affecting Fertility)

ছাগলের উর্বরতার ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী অনেক কারণ রয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে এসব কারণকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ছাগলের জাতিগত নমুনাভিত্তিক কারণ যাদের কৌলিতাত্ত্বিক কারণ (genetic factors) হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং দ্বিতীয়ত ছাগলের লালন-পালন, পাল দেয়া ও প্রজননে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রকার পারিবেশিক কারণ যাদের পারিপার্শ্বিক কারণ (environmental factors) হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিচে এসব কারণ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

(ক) কৌলিতাত্ত্বিক

ছাগলের জাতি নমুনাকে জেনোটাইপ বলে। বিভিন্ন ছাগলের উর্বরতা ক্ষমতা ভিন্ন উদাহরণস্বরূপ ১৯-৭৯% ভারতের মালাবার জাতের ছাগল দ্বিতীয় প্রসবকাল থেকে প্রতিবার প্রসবকালে ২-৩টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তুরস্কের কিলি (Kili) ও টেকসাসের এংগোরা জাতের ছাগল যথাক্রমে ৫, ৭ বছর বয়সে বাচ্চা উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। ছাগলে উর্বরতা ও বহু বাচ্চা প্রসব করা বয়সের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

(খ) পারিপার্শ্বিক

১। তাপমাত্রা
২। ঋতুর পরিবর্তন
৩। খাসির ব্যবস্থাপনা
৪। সঠিক পাল দেয়ার সময় নির্ণয়
৫। সঠিক সময়ে পাল দেয়া
৬। পুষ্টির অবস্থা
৭। পরজীবির আক্রমণ
৮। রোগব্যাধির উপস্থিতি।

সারণি এ পাতায় বরবারী যমুনাপারী ছাগলের পুষ্টিজনিত কারণে গর্ভধারণের বিভিন্ন হার দেখানো হয়েছে। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ছাগলকে প্রয়োজনীয় শক্তি ও

আমিষ খাদ্য সরবরাহ করার উপর নির্ভর করে বাচ্চা/দুধ/মাংস উৎপাদন এই কথাটি ছাগলের খামার মালিগণকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

প্রজনন পদ্ধতি (Breeding Methods)

ছাগলের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি তথায় অর্থকরী লক্ষণগুলোর পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধি ছাগল প্রজননের একটি মৌলিক দিক। আত্ম উৎপাদনে সক্ষম এবং ডিএনএ যারা গঠিত জীবকোষস্থিত ক্রোমোজোমের যে একক খণ্ডাংশ কোন পূর্ব পুরুষ ছাগল থেকে তার উত্তর পুরুষ ছাগলের বৈশিষ্ট্যাবলীর বংশগতির ক্ষেত্রে ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে তাকেই জিন (gene) বলে। স্ত্রী ছাগলের জনন ও পাঠার জনন কোষে অবস্থিত জিনসমূহের মাধ্যমেই এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের চারিত্রক বৈশিষ্ট্যসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয়।

সারণি ৪৫ ঃ ছাগল থেকে প্রাপ্ত উপাদনের বৈশিষ্ট্যর সংজ্ঞা সম্পর্কিত তথ্য

উপাদান	পরিমাণ	গুণগত মান
মাংস	বৃদ্ধির হার উৎপাদন দক্ষতা	চর্বির পরিমাণ মাংসে চর্বির উপস্থিতি ও ছড়ানোর ধরন
দুধ	প্রতি দুগ্ধদানকাল উৎপাদনের পরিমাণ	দুধে ননীর উপস্থিতির হার (%)
মোহেয়ার (Mohair) পশমিনা	প্রতি ছাগলের উৎপাদনের পরিমাণ	তন্তুর ব্যাস, দৈর্ঘ্য ও উজ্জ্বলতা
চামড়া	ওজন/সংখ্যা	চামড়া পুরুষ ও লোমের ঘনত্ব।

ছাগলের লক্ষণগুলো (traits) যেহেতু বংশগতির একক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং লক্ষণভেদে মূল কারণ বংশগতি এককের পার্থক্য সেহেতু ছাগল প্রজননে কিছু প্রত্যাশিত জেনোটাইপ সমাবেশ ঘটানোই মূল কথা। ছাগলের সংখ্যায় প্রত্যাশিত জেনোটাইপ সমাবেশ ঘটাতে পারলেই গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। সেইজন্য পশু বিজ্ঞানীগণ মিলন (mating) ও বাছাই (selection) প্রক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এর সাথে পরিবেশ পরিচর্যা, রোগব্যধি দমন ও পুষ্টিসাধন জড়িত। ছাগলের

উৎপাদন বৃদ্ধি একটি সার্বিক সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফল আর ছাগল প্রজনন সমন্বিত কার্যক্রমের একটি প্রধান দিক মাত্র। সাঠিক প্রজনন পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগলের দুধ, মাংস, লোম পশম, চামড়া এইসবের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়ন।

ছাগলের উৎপাদিত উপাদানের গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি ৪৫-এ দেখানো হয়েছে এবং ছাগলের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে —

এক. **সংজনন হার** (Reproduction rate) ঃ প্রতি প্রসবকালে বাচ্চাদানের সংখ্যা অথবা বছরে জন্ম দেয়া বাচ্চার সংখ্যা।

দুই. **উৎপাদনের জন্য খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা** (Efficiency of Feed conversion): ছাগলের বাচ্চার দ্রুত দেহ বৃদ্ধি উভয় বৈশিষ্ট্যই একসাথে বিবেচনা করতে হবে যেমন স্ত্রী ছাগলের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং সে অনুপাতে এরই দুধ ছাড়ানো (weaning kids) বাচ্চা ছাগলের ওজন উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণগতমান ভাল হতে হবে নতুবা তা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মাংসে অতিরিক্ত চর্বি বা বিশেষ গন্ধ, যা পাঠার মাংসে কোন কোন সময় থাকে, মানুষ পছন্দ করে না।

পুনঃসংযোজন (repeatatrilty) এবং বংশগতির ধারক ও বাহক (heritabilty) এর ধারণা সারণি ৪৬-এ দেখানো হলো ।

প্রজননের জন্য ছাগল নির্বাচন

প্রজননের জন্য প্রতিটি ছাগলের ভাল গুণাবলী দেখে নির্বাচন করতে হবে যাতে এসব গুণাবলী পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। প্রজননের জন্য নির্বাচিত পাঠা ছাগলের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো হচ্ছে —

১। নির্বাচিত পুরুষ ছাগলটি (পাঠা) দলের মধ্যে সেরা বলিষ্ঠ, শক্তিশালী, পা, নাদুশ-নুদুশ চেহারা প্রশস্ত বুক ও রোগমুক্ত হতে হবে।

২। দৈনিকভাবে নিখুঁত দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হতে হবে।

৩। পাঠাটি জমজ (twin) হ'তে হবে।

৪। পাঠাটি রুক্ষ মেজাজের হ'তে হবে (aggressive)

৫। পাঠাটির গলায় ও কাঁধে সুন্দর কেশর থাকতে হবে যা প্রজনন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

৬। পাঠাটির অবশ্যই উন্নত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন মা-বাবার সন্তান হ'তে হবে।

সারণি ৪৬ ঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের বিভিন্ন জাতের ছাগলের বিশেষ লক্ষণ (traits)

লক্ষণ (Trait)	জাত (Breed)	দেশ (Location)	পুনঃ সংযোজন (repeatability)	বংশগতির (Heritability)
জন্মের সময় ওজন (Birth wt.)	বিটাল (Beetal)	ভারত	–	০.০১
বাচ্চা প্রসবের বিরতিকাল (Kidding interval)	বিটাল	ভারত	০.০৫–০.০৬	–
দুগ্ধদান সময় (Length of Lactation)	১ম১ এ নি × কে এক২ এ নি × কে ক্যাটজাং	মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া	০.১৭ ০.৫৩ ০.২৯	

এনি × কে = এংগ্লো নিউরিয়ন × ক্যাটজাং

এক ১ (F_1) প্রথম সংকর পুরুষ (First fillal generation) বলে, এক ২ (২) দ্বিতীয় সংকর পুরুষ (seceond fillal generation) বলে।

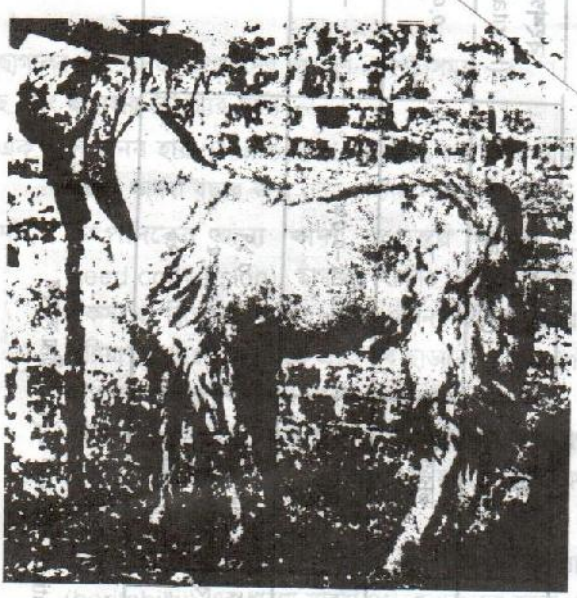

চিত্র ৫৮ ঃ প্রজননের জন্য উপযুক্ত একটি যমুনাপারী পাঠা দেখানো হলো

প্রজননের জন্য নির্বাচিত স্ত্রী ছাগলের যেসব গুণাবলী থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে —

১। দলের মধ্যে আকারে বড় হতে হবে। সুঠাম দেহের অধিকারী হতে হবে এবং দেখলেই যাতে বোঝা যায় যে ছাগলটি এই জাতের অর্থাৎ দৈহিকভাবে নির্দিষ্ট জাতের প্রতিনিধি হতে হবে।

২। মাংসের জন্য ব্যবহৃত হলে মাংসবহুল স্ত্রী ছাগল হতে হবে। দুধের জন্য হলে বড় উলান ও লম্বা পা-বিশিষ্ট হতে হবে।

৩। উলানে দু'য়ের অধিক বাঁটযুক্ত (teats) (চিত্র) ছাগল প্রজননের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জাতীয় বাঁট (super numerary teats) বাচ্চা বয়সে অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে।

৪। ছাগলটি অবশ্যই যমজ (twin) হতে হবে।

৫। ছাগলটি শান্ত প্রকৃতির হতে হবে। বাচ্চাকে আদর করার গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে।

৬। বেশি দুধ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বংশোদ্ভুত হতে হবে। পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect selection) যেমন—

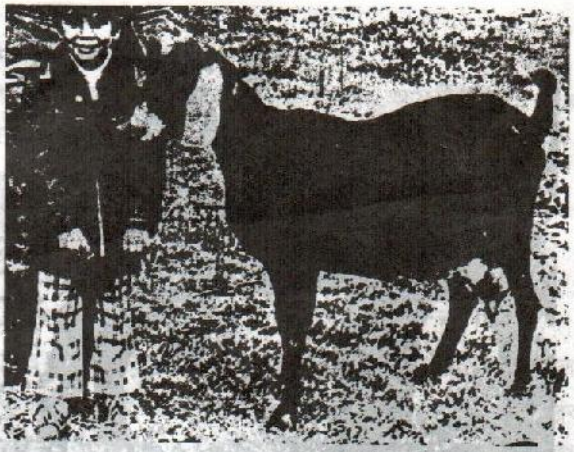

চিত্র ৫৯ ঃ প্রজননের জন্য নির্ধারিত একটি স্ত্রী ছাগল

১। দ্রুতবৃদ্ধি (Rapid growth) যা তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্বতা এবং মাংস উৎপাদনে সহায়ক। দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য খাদ্য রূপান্তরিত করার দক্ষতা থাকতে হবে। এইসব বিষয় ও ছাগল প্রজননের জন্য নির্বাচনে বিবেচনা করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রজননের জন্য উপযুক্ত নয় এমন ছাগল খামার থেকে বাদ দিতে হবে (cutting)।

ছাগলের মিলন পদ্ধতি (Mating systems)

পশু-পাখির প্রজননে বিভিন্ন ধরনের মিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিকাংশ দেশেই ভাল জাতের ছাগলের অভাব রয়েছে তাই উৎপাদনও কম। এর জন্য যে বিষয়টির বেশি অভাব সেটি হচ্ছে সঠিক উৎপাদন তথ্য এবং অধিক উৎপাদন সক্ষম ছাগল বা ছাগলের জাত চিহ্নিতকরণ। ভাল জাতের ছাগল চিহ্নিত করে সেগুলোর ভাল গুণাবলী সমাবেশ ঘটিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

চিত্র ৬০ ঃ ছাগলটির একটি অতিরিক্ত বাঁট দেখানো হয়েছে

উন্নয়নশীল দেশেই অধিকাংশ ছাগল পালন করা হয়ে থাকে এবং সেইসব দেশে সাধারণত পরিকল্পিত কোন ছাগল প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয় না, অথচ তা-ই হওয়া উচিত। এমনকি এইসব দেশের অনেক জাতের ছাগলের অনেক ভাল গুণাবলী রয়েছে। যেমন বাংলাদেশের যমুনাপারী ও ব্ল্যাক বেংগল ছাগল, কিন্তু এইগুলো নিয়ে তেমন পরিকল্পিতভাবে প্রজনন ব্যবস্থা চালানো হচ্ছে না।

সম্প্রতি রাজশাহী ও ঢাকার সাভারে দু'টি ছাগল প্রজনন ও উন্নয়ন খামার সরকারিভাবে স্থাপিত হয়েছে। এইগুলোর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এই দেশের ছাগল উন্নয়নের অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলের ছাগল প্রজনন নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর —

(ক) স্থলাভিষিক্তকরণ (Substitution)।

(খ) পরিবর্তিত করা বা সামান্য পরিবর্তন করা (Modification)।

(গ) মান উন্নয়ন করা (Upgrading)।

(ক) স্থলভিষিক্তকরণ (Substitution)।

দেশীয় বা স্থানীয় জাতের ছাগলকে উন্নত জাতের আমদানি করা ছাগল দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা (replacing) যেতে পারে। কখন এটি করা যেতে পারে —

১। স্থানীয় ছাগল আকারে ছোট হলে

২। স্থানীয় ছাগলের উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে।

৩। যেখানে মানুষের আমিষ খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আমিষ খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো খুবই জরুরী হলে।

৪। আবহাওয়া ও পরিবেশ ছাগল পালনের ও উন্নয়নের জন্য উপযোগী হলে।

স্থলাভিষিক্তকরণ স্থানীয় ছাগলের পুরো সংখ্যা একসাথে করার পরিকল্পনা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়, কারণ স্থানীয় ছাগল আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে জীবনধারণ করতে পারে। এরা এদের স্থানীয় রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী, যা আমদানি করা ছাগলের থাকে না। স্থানীয় ছাগলের উর্বরতা ক্ষমতা বেশি। পরিকল্পিত প্রজনন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এইসব গুণাবলী ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভাল জাতে কিছু সংখ্যক পুরুষ (পাঠা) ছাগল আমদানি করে নির্বাচিত স্ত্রী ছাগলের সাথে প্রজনন করিয়ে জাত উন্নয়ন করা যেতে পারে, যা স্থানীয় ছাগলের ভাল গুণাগুণ সংরক্ষণ করতে সাহায্য করবে। ভারত ও ভেনেজুয়েলায় এইজাতীয় কর্মসূচি নিয়ে সফলতা লাভ করেছে।

(খ) পরিবর্তিত করা

এর উদ্দেশ্য হলো বর্তমান স্থানীয় ছাগলের সংখ্যাকে উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতি করা। স্থানীয় ছাগলের মধ্য থেকে ভাল গুণাগুণসম্পন্ন ছাগল বাছাই করে এদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নত করা। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে এক যুগেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

(গ) জাত উন্নত করা

স্থানীয় ছাগলের উৎপাদন ক্ষমতা (genetic quality) বাড়ানোর জন্য জাত উন্নত করার (upgrading) কর্মসূচিটি গ্রীষ্মমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ছাগল আমদানি করে স্থানীয় জাতের ছাগলের সাথে প্রজনন করাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঝাঁটি এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন জাতের ছাগল আমদানি করে স্থানীয় ছাগলের সাথে প্রজনন করাতে থাকলে দেশের আবহাওয়া উপযোগী এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন ছাগল পাওয়া যাবে।

এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন ছাগলের সাথে ক্রাইওল্লো ছাগলের ধাপে ধাপে প্রজনন করিয়ে কিভাবে খাঁটি এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন পাওয়া যায় নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

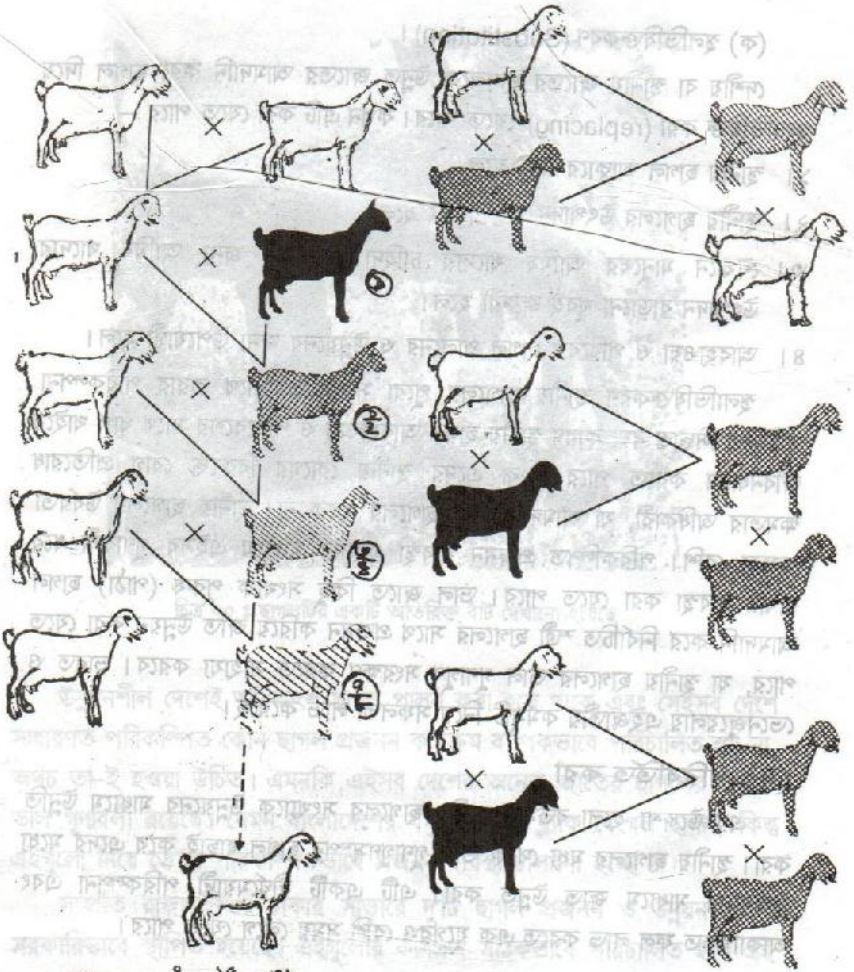

চিত্র ৬১ঃ $\frac{৭}{৮} \rightarrow \frac{১৫}{১৬} \rightarrow \frac{৩১}{৪২} \rightarrow$ খাঁটি এ্যাংগ্লো-নিউবিয়াল ছাগল

চিত্র ৬২ঃ প্রজননের ধাপ কমিয়ে প্রথম প্রজননে (F1) দ্বিতীয় প্রজননের (F2) বংশধর পাওয়ার পদ্ধতি

উপরের পদ্ধতিতে প্রজনন করালে প্রথম প্রজননে (F_1) কিভাবে দ্বিতীয় ধাপে (F_2) বংশধর পাওয়া যায় তা দেখানো হলো। এতে ধাপ কমানো যায় —

চিত্রে দেখানো প্রথম প্রজননের ছাগলকে (F_2) দ্বিতীয় প্রজননের (F_2) ছাগলের মতোই দেখাচ্ছে। জেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য এই পদ্ধতিতে প্রজনন করানো, সেইগুলো উৎপাদন কম দিবে সেগুলোকে বাদ দিতে হবে, অনেক দেশই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাগলের জাত উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে যেমন —

ইসরাইলের স্থানীয় ছাগল × সানেন (সুইজারল্যান্ড/ডাচ),

মালয়েশিয়ার স্থানীয় ছাগল × এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন = এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন

মরিশাসের স্থানীয় ছাগল × এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন = এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন

ফিলিপাইনের স্থানীয় ছাগল × এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন = এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন

অষ্ট্রেলিয়ার স্থানীয় ছাগল × এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন = এ্যাংগ্লো নিউবিয়ন

ভারতে ও ছাগলের জাত উন্নয়নের জন্য এই পদ্ধতি – কার্যক্রম চলছে

ক্রসব্রিডিং (cross breeding)

দুটি খাঁটি জাতের মিলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ছাগলকে সংকর জাতের ছাগল বলা হয় এবং প্রক্রিয়াটিকে ক্রসব্রিডিং (cross breeding) বলা হয়। কোন কোন সময় পুরুষ ছাগলটি খাঁটি জাতের এবং স্ত্রী ছাগলটি সংকর জাতের এই দু'য়ের মধ্যে প্রজনন করানোকেও ক্রসব্রিডিং (cross breeding) বলা হয় ক্রসব্রিডিং পদ্ধতি গ্রীষ্মমণ্ডলে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। এ্যাংগোরা (Angora) জাতের ছাগল ভারত, মাদাগাস্কার, অস্ট্রেলিয়া ও ভেনেজুয়েলায় ক্রসব্রিডিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলাতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালু আছে যেমন –

১। ক্রাইওল্লো (Criollo) × নিউবিয়ন (Nubian)

২। ক্রাইওল্লো (Criollo) × সানেন (Saanen)

৩। ক্রাইওল্লো (Criollo) × টোগেনবারগ (Toggenburg)

৪। ক্রাইওল্লো (Criollo) × ফ্রান্স আলপাইন (France Alpine)

এই ধাপে অন্য জাতের স্ত্রী ছাগল ব্যবহার করতে হবে।

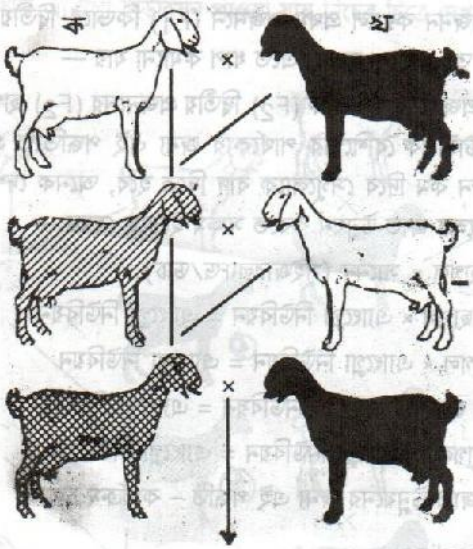

চিত্র ৬৩ ঃ সাধারণ ধারাবাহিক ক্রসব্রিডিং পদ্ধতি দেখানো হয়েছে

ব্যাক ক্রসিং (Back Crossing)

কোন সংকর জাতের (hybrid) অথবা হেটারোজাইগাস (heterozygous) জাতের সাথে তার কোনও একটা হোমোজাইগাস (homozygous) জাতের পিতৃপুরুষের সংকরায়ন বা পরিনিষেক করানোর পদ্ধতিকে ব্যাক ক্রস (Back Cross) বলে। ব্যাকক্রস এক ধরনের টেস্ট ক্রস যার মাধ্যমে কোন অজানা প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী ছাগলের জেনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়। এইজন্য সে অজানা জেনোটাইপবিশিষ্ট প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী ছাগলের সাথে একই প্রজাতির প্রচ্ছন্ন এ্যালেলিক জিন (allelic gene) বহনকারী অন্যএকটা জাতের সাথে সংকরায়ন বা পরনিষেক করা হয়। ব্যাক ক্রসিং পদ্ধতিটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায় –

জাত ক × জাত খ

F_1 ক ৫০%

খ ৫০% × ক ব্যাক ক্রসিং

F_2 ক ৭৫%

খ ২৫% × খ রোটেশনাল ক্রসিং

F_3 ক ৩৭.১৫%

খ ৬২.৫০% × ক

F_4 ক ৬৮.৭৫%

খ ৩১.২৫%

জাত পরিবর্তন করে প্রজনন পদ্ধতি চলতে থাকবে।

ছাগল খামার মালিকগণ ক্রসব্রিডিং এ ব্যবহৃত স্ত্রী ছাগল/ পুরুষ ছাগল দ্বয়ের উৎপাদন ক্ষমতা থেকে বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ছাগল পাবার প্রত্যাশী এবং ক্রসব্রিডিং-এর মাধ্যমে এই জাতীয় ছাগল পেয়ে থাকে যাকে হেটারোসিস (heterosis) বা সংকর (hybrid vigor) বলে। হাইব্রিড ভিগর পাওয়ার জন্য–

(ক) ধারবাহিক ক্রসব্রিডিং (Coutinuous cross breeding)

(খ) অধারাবাহিক ক্রসব্রিডিং (Non-continuous cross breeding)

পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে স্ত্রী ছাগলটি সংকর জাতের হতে হবে। এই ধরনের প্রজনন পদ্ধতির জন্য দু' জাতের খাঁটি পাঠার (পুরুষ ছাগল) দরকার। অথবা তিন জাতের খাঁটি পাঠা ব্যবহার করে আবর্তিত পদ্ধতিতে (rotational cross breeding) প্রজনন করানো যেতে পারে। তবে এতে খামারে

চিত্র ৬৪ ঃ ভারতে ক্রসব্রিডিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত একদল ছাগল দেখা যাচ্ছে

ছাগলের আকৃতির ক্ষমতা থাকে না। বাণিজ্যিক ছাগল খামারের জন্য ক্রসব্রিডিং-ই (cros breeding) সবচেয়ে উপযুক্ত প্রজনন পদ্ধতি। ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির উন্নয়ন হলে সংকর জাতের (hybrid vigor) উৎপাদন করা সহজ হবে।

লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex Determination)

ছাগলের ৩০ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২৯ জোড়া অটোজোম (autosome) ও একজোড়া সেক্স ক্রোমোজোম (sex chromosomes) রয়েছে। প্রতিটি ডিম্বাণুতে ২৯ জোড়া অটোজোম ও এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম রয়েছে ডিম্বাণুর সেক্স ক্রোমোজোম XX দিয়ে প্রকাশ করা হয়। স্ত্রী ছাগলের ডিম্বাণুর মতোই প্রতিটি শুক্রাণুতে ২৯ জোড়া অটোজোম ও এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে যা XY দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পাঠার শুক্রাণুর অতিরিক্ত এবং স্ত্রী ছাগলের ডিম্বাণুর X ক্রোমোজোমই লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর X ক্রোমোজোম দিয়ে নিষিক্ত হয় (XX) এর কারণে স্ত্রী বাচ্চা ছাগল পাওয়া যাবে পক্ষান্তরে ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর Y ক্রোমোজোম দিয়ে নিষিক্ত হয় তা হলে পাঠা (পুরুষ) বাচ্চা ছাগল পাওয়া যাবে। লিঙ্গ নিধারণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর X ক্রোমোজোম মিলছে না Y ক্রোমোজোম মিলছে তার উপর। এই মিলনটি দৈবাৎ আগাম ঠিক করার বা নিয়ন্ত্রণ করার সঠিক কোন কৌশল আজও আবিষ্কৃত হয়নি অবশ্য পশু প্রজনন বিজ্ঞানীরা এনিয়ে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন (Artiticial Insemination in goats)

গরু-ভেড়া শূকর ও মোরগ-মুরগি উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন করা পৃথিবী জুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে কিন্তু কৌশলগত কারণে ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি।

কারণ ছাগলের শুক্রাণু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বহনে কিছু টা সমস্যা থাকে তবে সুবিধা অনেক। যেমন —

১। প্রজননের জন্য অনেক পাঠা পালনের পরিবর্তে সীমিত সংখ্যক পাঠা পালন করে খরচ কমানো যায়।

২। একটি উন্নয়ন জাতের পাঠা অনেকগুলো স্ত্রী ছাগলের প্রজননের জন্য যথেষ্ট।

৩। যৌন সংক্রান্ত রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা নেই।

৪। তাড়াতাড়ি আকাঙ্ক্ষিত ছাগলের জাত সৃষ্টি করা যায়।

ইসরাইলে ছাগলে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবহার করে শতকরা ৫০ ভাগ ছাগলকে গর্ভধারণকরণে সম্ভব হয়েছে যা প্রাকৃতিক নিয়মে পাঠা ব্যবহারের চেয়েও বেশি। অতি সম্প্রতি ভারতে বারবারী ও যমুনাপারী ছাগলে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবহার করে যথাক্রমে ৭০.৮% ও ৮০% ছাগলকে গর্ভধারণ করাতে সক্ষম হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের কৌশলের সঠিক ব্যবহারই গর্ভধারণের হার বাড়িয়ে দিতে পারে। ভবিষ্যতে ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত হবে এ আশাবাদ অনেকের।

BANSDOC Library
Accession No. 18657

তথ্যপঞ্জি

ইংরেজি

১. Anonymous (1983-84). The Bangladesh census of Agriculture and livestock, Bangladesh Bureau of Statistics.

২. Anonymous (1983). Compendium of Data sheets of veterinery products. Data Pharm Publication Ltd. 12, White Halt, London.

৩. Anonymous (1976). Hand Book on Animal Diseases in the Tropics, 3rd Edn. Published by British Veterinary Association, London.

৪. Anonymous (1982), Illustrated Manual for the Recognition and Diagnosis of Certain Animal Diseases, Mexico Commission for the prevention of Foot and Mouth Disease, USA.

৫. Anonymous (1982). Goat production under traditional management Systems in Sri Lanka, vol. xii, no 8, Asian Livestock, Bankok, Thailand.

৬. Anonymous (1983). The Manual for Animal Health, Axillary personnel, FAO, United Nations Rome.

৭. Anonymous (1986). The Merek Veterinary Manual, published by Merek Co. Inc. Ranway NJ, USA.

৮. Anonymous (1949). Outline of Veterinary Science, Govt. of Pakistan.

৯. Anonymous (1961). Parasites and Parasitic Diseases of Sheep. Farmer's Bulletin No. 1330. United States, Dept. of Agriculture.

১০. Anonymous (1986). Annual Reports of Central Diseases Investigation Lab. Dhaka, Bangladesh.

১১. Anonymous (1983-84). Report on the Livestock Survey, Bangladesh Bureau of Statistics.

১২. Anonymous (1984-85). Statistical Year Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics.

১৩. Allan, Watt (1980). Neonatal loss in Lambs In practice, Landon.

১৪. Arther, G. H., Noales D.E., Pearson, H. (1986). Veterinany Reproduction and Ostetries, ELBS, Bailliere Tindal, London.

১৫. Bari, A.SM, and Dewan M.L. (1985). A case of Double Monster in a Black Bengal Goat. Bang. Vet. Joun. 19 (1-4) 89-90

১৬. Blood, D.C, Radostits, O.M, Henderson J. A. (1983) 6th Edition, Bailliere Tindall, London.

১৭. Debendra, C. (1974). Goats, their productivity and potential span 17, 130.

১৮. Debendra, C. (1986). Goat and Sheep Production in the Tropics, Intermediate Tropical Agriculture Series, FAO.

১৯. David Logne and Mastain Greig (Sept.,87), Infertility Bull, Ram, Boar, Collection and Examination of Semen In practice,London.

২০. Hans Helmrich (1986), Animal Husbandry in Bangladesh, Institute of Rural Development, University of Gottengen, Germany.

২১. Daykir P. W. (1960). Veterinary Applied Pharmacology and Therapentics, Bailliere Tindall, London.

২২. Eddy, Roger (1990). Analysis Dairy herd Firtility Inpratice, London.

২৩. Islam A. W. M. S. (1982). Hydatid Disease in Goats in Bangladesh, Veterinary Parasitology. VII-II 103-107.

২৪. Islam M. N., Khan M.A.B. Mia M. M. (1982). Histology and Histochermistry of the salivary glands of Black Bengal goats. Beg. Vet. Jour. 16 (1-4), 11-13.

২৫. Jabber, M. A. and Green DAG (1983). The Status and Potential of Livestock within the Context of Agriculture, Development policy in Bangladesh, Deptt. of Agricultural Economics B.A.U. Mymensingsh.

২৬. Karim M.J. Shaikh H and Hoque M.M. (1982). Prevalence of larval Taenidae in Goats in Bangladehs. *Trop. Anim. Hlth prod.* 14 (3) 166.

২৭. Kelly W.R., (1984). : Veterinary clinical Diagnosis, 3rd Edn. Bailliere, Tindall, London.

২৮. Kitching R.P., Megrane J.J., Hammond M.J., Mia. A.H., Mustafa, A.H.M., Majumder J.R., Capri Pox in Bangladesh, Trop. Anim, Hlth, Prod. (1978),19, (203-208) 2, 12.

২৯. Mandal M. M. H. and Qader, A.N.M.A, (1978). The Preliminary Investigation on the Incidence of coccidial Infection in Fowls, Sheep, goats, and Calth *Bang. Vet. Jour.* XII, 1-4, 7-11.

৩০. Mia Abdus Salam (1967). Urinary Iolculi in Farm Animals and its Surgical Treatment. Pak. Vet.Jour. Vol 1 - 1, 20-23.

৩১. Mia A. H., Majumder J.R., Pandit K.K., Mustafa A.H..M. Selim Sk. A. (1986). Studies on Goat Pox Virus Isotated From An Outbreak in Bangladesh. 5th. Ann. Conc. Society of Microbiologists, Bangladesh.

৩২. Momen M. A. (1964). Goat Farming, In : Livestock Wealth in East Pakistan. P-82.

৩৩. Mustafa A.H.M. (1984). Bracella Antibodies in the Sera of Domestic Livestock in Bangladesh. Trop. An. Helth. Prod. Vol. 16(4) 212

৩৪. Mustafa A.H.M. (1984). Anthrax in Elephant. Vet. Record. 114, 591

৩৫. Mustafa A.H.M., Khatoon, Helen, Biswas H R. (1993). Investigation on Pseudo Rinder pest in Bangladesh, personnal commecing condition.

৩৬. Patnaik R.K. (1986). Epidemic of Govt. Dermatetic In India Trop. Anim. HLTH. Prod. 18, 137-138.

৩৭. Peter Dunn (1980). Diseases of Dairy goats, 1980, Vol. 2 No. 5, In practice, London.

৩৮. Qadir A. N. M. A. (1981). A preliminary study on the epidemiology of Fasciolosis in goats in Bangladesh. Bang. Vet. Jour. XV1, 27, 12

৩৯. Rahman A, Samad, A, Hoque M. M., (1978). Clinico-pathological Studies on psoroptic Mange in Goat : Bang. Vet. Goat. XII 1-4, 53-55

৪০. Rahman A. and Ahmed M.U. (1976). Studies on the Diseases of goats in Bangladesh. Mortality of Goats under Farm and Rural condition. Trop. Anim. Prod. VII-123.

৪১. Rahman A., Ahmed M.U., Mia A.S. (1975). Diagonosis of Goats in slaughter host in Bangladesh. Trop. Anim. HLTH. Prod. VII 164

৪২. Rahman A. Ahmed M.U., and Mia A.S. (1975). Goat Diseases of Four different Vet. Hospitals in Bangladesh. Bangladesh. Trop. Anim. HLTH. Prod. VII-236.

৪৩. Souls- by EJ. (1986). Helminthes Athoropods and protozoa of Domesticated Animals, 7th Edn. ELBS. Bailliere Tindod, London.

৪৪. Taylor, M. 87, Liver Fluke Treatment, In practice, London.

৪৫. William G. , Payne W.J. (1978). An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics, ELBS, Longman, London.

বাংলা

১. অজানা ঃ পশু-পাখির সুষম খাদ্য (১৯৯৩), মাসিক মৎস্য ও পশুসম্পদ বার্তা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ সাল

২. মোস্তফা, ডাঃ এ. এইচ. এম. ১৩৭৯ বাংলাদেশের গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা। মাসিক কৃষিকথা

৩. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৮৫ বাংলাদেশের গবাদি পশুর উদরাময় রোগ। মাসিক কৃষিকথা

৪. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৮৬ বাংলাদেশের গাভীর ওলান প্রদাহ রোগ। মাসিক কৃষিকথা

৫. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৮৬ বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুপাখির প্রতিষেধক ইনজেকশন। মাসিক কৃষিকথা

৬. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৮৭ বাংলাদেশের গবাদিপশুর তড়কা রোগ ও প্রতিকার। মাসিক কৃষিকথা

৭. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৯২ বাংলাদেশের গবাদিপশুর যক্ষ্মা রোগ ও মানুষের মাঝে এর প্রতিক্রিয়া। মাসিক কৃষিকথা

৮. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৯৩ বাংলাদেশের ছাগলের বসন্ত রোগ ও প্রতিকার রোগ। মাসিক কৃষিকথা।

৯. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৯৩ বাংলাদেশের ছাগল উন্নয়নে কিছু সুপারিশ। মাসিক কৃষিকথা।

১০. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৯৪ বাংলাদেশের বিষ গবাদিপশু উন্নয়নের অন্তরায়। মাসিক কৃষিকথা।

১১. মোস্তফা, ডাঃ এ, এইচ, এম, ১৩৯৫ বাংলাদেশের ছাগল পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব মাসিক কৃষিকথা।

১২. জব্বার, মোঃ আবদুল (১৯৮৫) বাংলাদেশে পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি ও কৌশল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩. হক, ডাঃ মোজাম্মেল, পশু–পাখির কীট পতঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড,, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪. সিদ্দিকী, ডাঃ এল আর , (১৩৯৬) মাসিক পশু সম্পদ বার্তা, ঢাকা

BANSDOC Library Dhaka